পিশাচ

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—দুই টাকা—

মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে জি, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রাকর প্রমথ নাথ সিংহ, মানসি প্রেস ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার জন্মদাতা—পিতা ও পরম বন্ধু

বাবুজীকে

—দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

ভূমিকা

পিশাচ ধারাবাহিক ভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইতেছিল—অকস্মাৎ আত্মগোপন করে। ইহার জন্য শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় অথবা লেখক দায়ী নহেন। ঘটনাচক্রের ফলে ঐরূপ ঘটিয়াছিল,—সুতরাং ভবিতব্যকে মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

দীর্ঘকাল পরে বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুবর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীহীন) ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় 'পিশাচ' পুনরায় গ্রন্থের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। আত্মগোপনের পরেও পিশাচকে বাঁচানো সমীচীন হইয়াছে কিনা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

এই সূত্রে বন্ধুবর তারাশঙ্কর ও শ্রীমান সনৎকুমারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। উভয়ের সাহায্য না পাইলে পিশাচকে পূর্ণ কলেবরে দেখিবার সুবিধা আমি হয়ত পাইতাম না। পিশাচের জন্য অনেকগুলি ছবি আঁকিয়াছিলাম, হাফটোন ছাপানো সম্ভব না থাকায় অনেক ছবি বাতিলের মধ্যে পড়িয়াছে।

মাদ্রাজ
১০ জুন, ১৯৪৪

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

পিশাচ

(১)

প্রিন্‌স মহেন্দ্র

কাল দ্বিপ্রহর, চৈত্রের রৌদ্রে দগ্ধ মাটি চটিয়া ফাটিয়া খানখান হইয়া গিয়াছে। আকৃতি তাহার কুষ্ঠরোগীর চর্ম্মের মত। ভীতিপ্রদ আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়, হয়তো বা উহার সংস্পর্শে আসিলে উলঙ্গ পা দুইটা ফাটিয়া কুষ্ঠের মত দেখাইবে।

দূরে—বহুদূরে বাষ্প ও বালুকণার ধূসর আবরণ, তাহারই অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছে আকাশ ও ভূমির সীমান্ত-রেখা। সীমান্তের সঙ্গমস্থলে তরুবেষ্টিত সুপ্ত গ্রাম। মাঝে মাঝে দুই-একটি অস্পষ্ট কুটীর আলাদাভাবে দেখা যায়।

এমনই একটি স্থানের মধ্য দিয়া পথিক চলিয়াছে একেলা। মুখের চারিত্রিক আকর্ষণ কঠোর, বর্ণ গৌর, ঝলসিয়া গলিত তাম্রের মত দেখাইতেছে। শরীর ঋজু, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে দৃঢ়। মাংসপেশী সম্পূর্ণ মেদবর্জ্জিত, শুষ্ক চেলা-কাঠের মত মোটা ও মজবুত হাড়গুলিকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া আছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় কপাল হইতে বৃষ্টির ধারার মত ঘাম ঝরিতেছে। পদতলে অগ্নুত্তপ্ত ধরণী তৃষ্ণার্ত্তের মত নরদেহ-নির্ঝরিত বারিবিন্দু শোষণ করিয়া ফেলিতেছে। জনমানবহীন এমন একটি আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া কাহাকেও চলিতে দেখিলে মন অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে—পথিকের রহস্যময় প্রকৃতি ও গন্তব্যস্থলটি জানিবার জন্য।

পথিক রামগড়ের প্রিন্‌স মহেন্দ্র পাল। রাজবংশের শেষ কুলপতি বলিয়া সরকার তাহাকে প্রিন্‌স মহেন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং যৎসামান্য মাসোহারাও দেন।

মহেন্দ্রের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা ফৌজদারী আদালতের নথিতে লিপিবদ্ধ না করিয়া আইন-রক্ষকরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। গ্রামের লোক মহেন্দ্রের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠে। এমন কি, হালে বাহাল দারোগাবাবু পর্য্যন্ত, আশেপাশে চার-পাঁচটি কন্‌স্টেব্‌ল না থাকিলে নিজের এলাকায় পাইয়াও মহেন্দ্র পালের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে দোমনা হইয়া থাকেন। কারণ মানুষটি

কখন কি কারণে চটিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; এবং চটিয়া উঠিলে কি ঘটিবে না, বলা শক্ত।

মানুষ-গুমি ইত্যাদি কারণে সরকার দুই-দুইবার মহেন্দ্রকে শ্রীঘর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল প্রিন্স দুশ্চরিত্র বলিয়া নজরবন্দীর খত স্বাক্ষরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বিচারের বিরুদ্ধে সে আপীল করে নাই।

মহেন্দ্র নজরবন্দী হইবার পর হইতে একবেলা থানায় হাজিরা দিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন পার্থক্য ঘটিয়াছে বলা চলে না। পুরাতন দারোগাবাবুর কথা এখনও গ্রামের লোক বলাবলি করিয়া থাকে—আহা, বেচারা দারোগাবাবু কর্ত্তব্য করিতে আসিয়া চাবুক খাইয়া হাসপাতালে ভুগিতেছে!

কিছুদিন আগের কথা, মানুষ-গুমির অপরাধে দারোগাবাবু মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া অযাচিত কতকগুলি উপদেশ বর্ষণ করিয়াছিলেন। দুশ্চরিত্রকে চরিত্রবান করিবার জন্য অনেকেই মহেন্দ্রকে প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া উপদেশ দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে। উপদেশ শুনা মহেন্দ্রের সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু দারোগাবাবু উপদেশ ছাড়া আর কিছু বলিয়াছিলেন, যাহাতে তালব্য শয়ের সহযোগে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইবার স্পষ্ট আভাস ছিল। মহেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গিয়া প্রিন্সের পূর্ব্বপুরুষদেরও টান মারিয়াছিলেন এই বলিয়া—অকেজো বাপ না হইলে মহেন্দ্রের মত পুত্র জন্মায়? মহেন্দ্রের ভগ্নী নাই এবং থাকিলেও দারোগার মত একজন সাধারণ চাকরের সহিত তাহার বিবাহ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা বুঝাইবার জন্য মহেন্দ্র দারোগার উপদেশের উত্তর দিয়াছিল একেবারে শঙ্করমাছের চাবুক কসাইয়া। মহেন্দ্রকে বাধা দিবে কে? চাবুকের পর চাবুক খাইয়া বেচারা দারোগার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। একটি কন্‌স্টেব্‌ল মহেন্দ্রের সৎকার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহাকে চাবুক মারিল না বটে, কিন্তু একটা কান দেহ হইতে নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক শক্তির দ্বারা টান মারিয়া মাথা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার পর অকস্মাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দারোগাকে বলিল, আমার পায়ের তলায় হামাগুড়ি দাও, জুতা পরিষ্কার করিয়া দাও। তাহার পর হঠাৎ আদেশ করিল, না, সোজা হইয়া দাঁড়াও। ভরা পিস্তল হাতে লইয়া যদি একটা মূষিকও আদেশ করে তো তাহা মানিতে হয়। দারোগা সোজা হইবার চেষ্টা করিল। সামান্য গেঁয়ো দারোগা, সে আর কত সোজা হইতে পারে বিশেষ করিয়া মহেন্দ্রের সামনে। মহেন্দ্রের হাতে মিহি করাতের মত চাবুক লিকলিক করিতেছিল। সে নিজেকে

সংযত করিতে পারিল না, দারোগার মুখের উপর সপাং করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। ডানদিকের চিবুকটা গভীর হইয়া কাটিয়া গেল। এই বাজে একটা লোক তাহার ভগ্নীপতি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে কেমন করিয়া, তাহা মহেন্দ্র ভাবিতে পারিতেছিল না। এত বড় উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত পুরস্কার এখনও দেওয়া হয় নাই ভাবিয়া বলিল, আমার জুতাটা চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া

প্রিন্স মহেন্দ্র

দাও। জুতাচাটা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করা দারোগা অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিল, মহেন্দ্রের আদেশ মানিল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হা হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর বলিল, তোমার আত্মসম্মানবোধ

এখনও আছে দেখিতেছি। আর ছোট করিতে চাহি না, তবে বাকি তিনটা কনস্টেবলের একটু শিক্ষা হওয়া দরকার, তোমার কথা উহারা শুনিয়াছে। তোমার অধীনে কাজ করিলে সাধুভাষা আরও উহাদের শুনিতে হইবে, কানগুলা নোংরা ভাষায় আস্তে আস্তে পচিতে থাকিবে। তার আগে উহাদের একেবারে কালা করিয়া দিই। কথা শেষ হইবার পর এক মুহূর্ত্ত সময় কাটে নাই। চক্ষের পলক না পড়িতে মহেন্দ্র পোশাক-পরিহিত দুইজন কনস্টেবলের গলা মুখামুখি-ভাবে একসঙ্গে চাপিয়া ধরিল, জাপানী কুস্তিতে নাকি এই কায়দায় ধরাকে জোড় কাঁচি বলে। বোধহয় এক মিনিটের বেশি সময় যায় নাই, ইহারই মধ্যে দেখা গেল, উভয় কনস্টেবলের নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। মহেন্দ্র ছাড়িয়া দিতে উভয়েই কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নাক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে সেদিকে লক্ষ্য নাই, কানের ব্যথায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী প্যাঁচের অদ্ভুত মহিমা! এই ঘটনার পর চতুর্থ কনস্টেবল হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্র দারোগাকে বলিল, মহাশয়, পেশা আপনার মানুষ ধরা, অকারণ আমার পূর্ব্বপুরুষদের বিরক্ত করিতে গিয়াছিলেন কেন? জীবিকা উপার্জ্জন গোলামির উপর, উন্নতিলাভ খোশামোদ অথবা বয়স বাড়াইয়া করিয়া থাকেন। আমার পিতা স্বর্গে গিয়া থাকিলে—গত রাত্রের বিলাসের পর আমেজে আছেন, নরকে গিয়া থাকিলে ঘানি টানিতেছেন। সোজা কথায় বসিয়া নাই। ভবিষ্যতে আশা করি, ভদ্রসন্তানকে ধরিতে আসিলে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি কথা বলিবার চেষ্টা করিবেন না। এখন চলুন থানায়। চালান দিতে হইবে তো। দারোগাকে থানায় যাইতে হইল না। রামগড় হইতেই গ্রামের জমিদার তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কনস্টেবলগুলিও তাঁহার অনুসরণ করিল এবং মহেন্দ্রকেও সঙ্গে লইয়া গেল। আদালতে যখন মকদ্দমা উঠিল, তখন চারিটি কনস্টেবল ও তৎকালীন উপস্থিত কয়েকজন গ্রামের লোক সাক্ষী দিল, তাহারা একেবারেই কিছু জানে না; এবং কনস্টেবলরা বলিল, দারোগার সহিত মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতেও যায় নাই। হাকিম সাক্ষীদের উক্তি বিশ্বাস করিলেন না; রায়ে লিখিলেন, প্রিন্স্ মহেন্দ্র দুশ্চরিত্র, প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি—আমার নিজের বিশ্বাস, দারোগার কর্ত্তব্যে প্রিন্স্ মহেন্দ্রই বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছে। যাহা হউক, আজ হইতে এক বৎসর মহেন্দ্রকে নিজ বাড়ীতে নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ছোট হাকিমের হুকুম মানিয়া লইয়াছিল। এই ঘটনার পর কনস্টেবলরা চাকরি ছাড়িয়া নিজ নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছে। যাহাতে বাকি জীবনটা চাকরি না করিয়া

তাহারা স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা মকদ্দমা আদালতে উঠিবার আগেই কেমন করিয়া হইয়া গিয়াছিল।

লোকে কানাঘুষা করে, মহেন্দ্র নিশ্চয় পালরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধান রাখে, তাহা না হইলে সকলের জবানবন্দী একেবারে উল্টা হইয়া গেল কেমন করিয়া? কত টাকাই না-জানি খাইয়াছিল, তাহা না হইলে চাকরির মায়া ছাড়িয়া তাহা মিছা কথা বলে? গুপ্তধনের কথা প্রকাশ্যে কেহ বলিতে সাহস পায় না; কি জানি, যদি সাক্ষী করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, দ্বিতীয় কারণ লোকেদের দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে, মহেন্দ্রের অমানুষিক শক্তি আছে, সে নাকি পিশাচসিদ্ধ। রাত্রিতে প্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাদহীন বড় ঘরটায় কত লোক দেখিয়াছে, একরাশ মানুষ ঘোরাঘুরি করে। পাথরের উপর উঁচু হইতে অগুনতি টাকা ফেলার কথাটাও নাকি সত্য। যেসব মানুষ মহেন্দ্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা মানুষের মত চলিলেও ঠিক মানুষ বলা চলে না—বেশভূষা কেমন অদ্ভুত ধরণের। যাহারা মহেন্দ্রের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া কথা বলে, তাহারা সকলেই ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, কেহ দেখে নাই। ভূতুড়ে কাণ্ড চাক্ষুস আর কে দেখিতে চায়? এইভাবে পালরাজাদের গুপ্তধন ও মহেন্দ্রের পৈশাচিক ক্রিয়ার বিবরণ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন ওজুহাত নাই।

বংশ-পরিচয়টার আজকাল তেমন চলন নাই। মানুষের আদিপুরুষ ঠিক বাঁদর ছিল কি না, তাহারই গবেষণা করিতে পণ্ডিতরা দিবারাত্র খাটিয়া মরিতেছেন। মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানে চরিত্রগঠন সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা আছে। পূর্ব্বপুরুষের চারিত্রিক দোষ অথবা গুণ অনেক স্থলে পুত্র, পৌত্র, এমন কি প্রপৌত্রের উপর আসিয়া পড়ে—ইহা অনেকের মতে মনোবিজ্ঞানের একটি খাঁটি সিদ্ধান্ত। মহেন্দ্রের চরিত্রে আর যাহাই থাকুক, সে যে একজন প্রিন্‌স্, এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। আদেশ করাটা তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাই মহেন্দ্রের নিজের এবং তাহার বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামগড় প্রাচীন পালরাজাদের গড়-বাড়ি অর্থাৎ একটি ছোটখাট দুর্গের মত। মধ্যস্থলে বিরাট প্রাসাদ। তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে নাতিবৃহৎ পাকা গাঁথুনির খাল; মাঝে মাঝে তোলা পোল। শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে পোল তুলিয়া লওয়া হইত। খালের গহ্বরটি এখন আছে, কিন্তু জল শুকাইয়া গিয়াছে। পোলের জীর্ণ অবস্থা অতীতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। আসল রাজা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে হইলে প্রত্নতাত্ত্বিকের কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়।

খালের শ্বাপদপূর্ণ ইটের পাঁজা জীবন্ত অবস্থায় হাঁটিয়া পার হইতে পারিলে

অনেকটা খালি জমি দেখিতে পাওয়া যায়। নানা আগাছা জন্মাইয়া স্থানটি ছোট ছোট ঝোপে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ধাসা কামানের টুকরা হইতে আরম্ভ করিয়া কারুকার্য্যখচিত তরবারি, বল্লম, ছোরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, অধিকাংশই প্রায় সমাধিস্থ। কোন সময় পরিত্যক্ত স্থানটি যে রণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ উঠে না। যোদ্ধার দল প্রাণ উৎসর্গ করিয়া পৌরুষকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে।

প্রাসাদ অট্টালিকা এখন পর্ব্বতসম ভগ্নস্তূপে পরিণত। প্রবেশপথের দ্বারগুলি বেশির ভাগই অগম্য, হয় কব্জা খুলিয়া কবাট এমন ভাবে হেলিয়া পড়িয়াছে যে, তাহা পাশ কাটাইয়া কোন মানুষ ভিতরে ঢুকিতে পারে না, নয় গাছের শিকড়ের পরিধি বাড়িয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া রাস্তা করিয়া লইতে হইলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহের প্রয়োজন হয়। প্রাসাদের অন্তিম দক্ষিণ কোণে কেমন করিয়া একটি ঘর টিকিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র এই ঘরটিতে বাস করে।

মহেন্দ্র উত্তরাধিকার-সূত্রে নগদ টাকা গহনা ইত্যাদি যাহা পাইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইবার পর যাহা ছিল, তাহা ভগ্নস্তূপ ও তৎসহিত অনেকগুলি পাশমুক্ত আগ্নেয় অস্ত্র, একরাশ টোটা এবং পাল-দীঘির জঙ্গল। জঙ্গলটির চৌহদ্দি দীর্ঘ পরিধি লইয়া বিস্তৃত। সোজা কথায় বাংলার হাঁপানি ও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কলেজে-পড়া অতি-আধুনিক তরুণতরুণীর দল এখানে বনভোজন করিবার সুবিধা পায় না। কারণ জঙ্গলের সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল হইতে আরম্ভ করিয়া বিষধর সর্প পর্য্যন্ত ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকে। মহেন্দ্র চলিয়াছে এই জঙ্গলের দিকে।

সরকার হইতে মহেন্দ্র যে তঙ্কা পায়, তাহা দ্বারা এক পক্ষের অধিক কোন সুস্থ মানুষের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে না। জীবনধারণের জন্য বাকি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি কি ভাবে সংগৃহীত হয়, এখনও কেহ জানিতে পারে নাই। লোকে বলে, মহেন্দ্র নাকি সন্ধ্যার পর মিহি শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ও অতি-মিহি ঢাকাই মসলিনের গিলা-করা পাঞ্জাবি পরিয়া থাকে। প্রত্যহ ধোপদুরস্ত কাপড় ও পাঞ্জাবি কে কুঁচাইয়া ও গিলা করিয়া দেয়, জানিবার কৌতূহল অনেকের থাকিলেও অনুসন্ধান করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। কি জানি অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোন্ বিপদে কে পড়িয়া যাইবে! মহেন্দ্রের কারবার তো শুধু মানুষের সহিত নয়।

চলিতে চলিতে মহেন্দ্র একবার দাঁড়াইল। প্রথম রৌদ্রের ঝলক চোখে

আসিয়া পড়িতেছিল, ভ্রূ-র উপর তালুর আড়াল দিয়া বহুদূরে দৃষ্টি চালাইয়া দিল, জঙ্গল এখনও দৃষ্টির বাহিরে, তবে ঘোষপাড়ার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘোষপাড়া একটি ছোটগ্রাম। নলিন স্বর্ণকারের বাসা গ্রামের গোড়াতেই। রাসমণি নলিনের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। ভাবিল, রাসমণির এখানে খানিকটা জিরাইয়া লইলে মন্দ হইত না; কিন্তু ঠিক এই সময়টিতেই রায়েদের ছোটকর্ত্তা নিয়মিত বিশ্রাম করিতে আসে। আসুক না, তাহাতে অসুবিধার কি থাকিতে পারে? ছোকরাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবে কি? কিন্তু বলপ্রয়োগে জমিদার-ছোকরাকে বাহির করিয়া দিবার অসুবিধা আছে অনেক। রাসমণির ছোকরাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বহুবার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। হয়তো চেঁচামেচি করিয়া হাট বসাইবে। এই কারণে ছোকরা মাত্রেই মহেন্দ্রের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহেন্দ্র ভাবিল, দুইবার তো দুইটিকে জঙ্গল দেখাইয়াছি, না হয় ছোটকর্ত্তা আর একজন হইবে। তাহার পর ভাবিল, না, ক্রন্দন-সহ সোহাগ মহেন্দ্রের পোষায় না। ঠিক করিল, সোজা জঙ্গলে চলিয়া যাইবে; কিন্তু দৈহিক ক্লান্তি মহেন্দ্রকে কাবু করিয়াছিল, একটু বিশ্রাম না লইলে আর চলে না।

সে মাঠের মাঝপথেই বসিল। পুরাতন গ্লাড্‌স্টোন ব্যাগটি নামাইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি রূপার সামরিক ধরনের জলপাত্র বাহির করিয়া মাত্র এক চুমুক জল খাইল, তাহার পর পাত্রটি উপুড় করিয়া অনেকটা জল জুতাজোড়া খুলিয়া তাহার ভিতর ঢালিয়া দিল। হঠাৎ কি মনে পড়ায় ভিতরের সমস্ত জিনিষপত্র তচ্‌নচ করিয়া ফেলিল; যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা পাওয়া গেল না। পকেট হাতড়াইল, সেখানেও নাই; অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, দৈবক্রমে কোমরবন্ধে হাত পড়ায় স্বস্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বস্তুটি একটি অতি বৃহদাকারের চাবি। চাবি পূর্ব্বস্থলে ভাল করিয়া গুঁজিয়া আবার ব্যাগের ভিতর হাত পুরিয়া দিল। এবার যাহা বাহির করিয়া আনিল, তাহার দৃশ্য ভয়াবহ। একেবারে অতি আধুনিক ধরনের অটমেটিক্ পিস্তল। অস্ত্রটি প্রয়োজনবোধে এক মুহূর্ত্তে বাঁট পরাইয়া রাইফেলের মত ব্যবহার করা চলে।

মহেন্দ্র একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া লইল, কেহ কোথাও নাই। গ্রাম অতি নিকটে, তথাপি কাকের দল পর্য্যন্ত নিঝুম মারিয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র উঠিল, জুতার ভিতর পা দিতেই খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িল। উত্তপ্ত মাটি দেখিতে দেখিতে তাহা শোষণ করিয়া ফেলিল।

মহেন্দ্র চলিতে লাগিল, প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপে পুরাতন স্মৃতি যেন সজোরে আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছিল। যে জল মহেন্দ্র পদতলে ব্যবহার করিয়াছে, সেই

জলেরই অভাবে একদিন এক তৃষ্ণার্ত্ত ছোকরা তাহার সামনে 'জল জল' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র নিজেকে সান্ত্বনা দিল, তাহার তো দোষ ছিল না। রাসমণির সন্দেহ-বাতিক বাড়িয়া না উঠিলে এ রকমটি কখনও ঘটিত না, সেই তো ছোকরাকে লেলাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার অদ্ভুত সাহস, জঙ্গল পর্য্যন্ত পিছু লইয়াছিল, ভাগ্যে সময়মত সন্দেহ আসিয়াছিল, তাহা না হইলে ছোকরা সিন্দুকের খবর লইয়া ফিরিয়া আসিত। না, ভালই করিয়াছে, সে বাঁচিয়া থাকিলে অকারণ বিপদকে পুষিয়া রাখা হইত। কথাতেই আছে—রোগের শেষ রাখিতে নাই। ছেলেটাকে চিরকালের জন্য সরাইয়া ভালই করিয়াছে। রাসমণি তাহার দরদের কথা আর বলিবে না। আমি কি রাসমণিকে প্রাণ ভরিয়া চাই নাই? চাওয়ার প্রতিদানে কি পাইয়াছিলাম? ওই ছোকরাগুলার গুণকীর্ত্তন—ছেলেটা দেখিতে কি সুন্দর, কি মিষ্ট কথা, কত ভদ্র ব্যবহার; ছোকরা হইলেই সব তাহার সুন্দর। রাসমণিকে মহেন্দ্র কি বলপ্রয়োগে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল? সে তো আপনি ধরা দিয়াছিল। ভালবাসার ভান না দেখাইলে সে কি ওর মত একটা মেয়ের পিছনে ঘুরিত, না টাকা খরচ করিত? তাহার অনুমান দারোগা জঙ্গলের খবর রাসমণির নিকটই পাইয়াছিল। রাসমণি বলে কিনা—মহেন্দ্রই ওর চরিত্র নষ্ট করিয়াছে! এক হাতে নাকি তালি বাজে! চুলায় যাক, মহেন্দ্র ঠিক করিল, রাসমণির সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। হরিদাসীর কাছেই যাইবে। কিন্তু এখন তাহার কাছে যাইতে হইলে অনেকটা পথ ঘুরিতে হয়। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মহেন্দ্র রাসমণির আটচালার প্রায় সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞাত আকর্ষণ তাহাকে এই পথে টানিয়া আনিয়াছে। মহেন্দ্র সামনের দিকে মুখ তুলিতে দেখিল, রাসমণি বিপরীত দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। দেহাবরণ যথেষ্ট শ্লথ হওয়ায় গঠনের রেখা-গুলি চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি পাইয়াছে। নধর নিটোল বক্ষ প্রায় অনাবৃত, পাত্‌লা ঠোঁট দুইটি রৌদ্রের ছটায় শাণিত ছোরার মত চকচক্ করিতেছে। ডাগর দুইটি চোখ, দৃষ্টি তাহাদের স্বভাবতই উদাস, কিন্তু আক্রমণের উপযুক্ত পাত্র পাইলে ক্ষণিকে মারাত্মক হইয়া উঠে। যেন বশীকরণ-শক্তি লইয়াই উহারা জন্মাইয়াছে। সংক্ষেপে, রাসমণির গঠন যেন ওস্তাদ ভাস্কর একটি গোটা কালো পাথর কাটিয়া বাহির করিয়াছে। চিত্রশিল্পীর ঝাপ্‌সা রঙের হেঁয়ালির এখানে স্থান নাই। রূপকার কেবল রেখার ছন্দ দিয়া রাসমণিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বাঁধিয়াছে। মহেন্দ্র রাসমণিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল। দর্শনকালীন প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন দৃষ্টিদ্বারা স্পর্শ করিতেছিল।

রাসমণি মুখ ঘুরাইতেই মহেন্দ্র তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া গেল। চিবুকটি নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ? এ কয়দিন আসতে পারি নি, রাগ কর নি তো? যুবতীর দেহস্পর্শে মহেন্দ্রের নেশা ঘোরাল হইয়া আসিতেছিল। রাসমণির আরও নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতেই সুন্দরী বাধা দিল, আঃ ছি, কর কি, ও যে ঘরে রয়েছে! মহেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, ঘোষেদের ছোট ছেলেটা নাকি? শ্লেষ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় নাই ভাবিয়া আবার বলিল, ও, সেই জমিদারপুত্র আরাম করছেন বুঝি? পালকি দেখছি যে! কথাটা শেষ করিয়াই মহেন্দ্র রাসমণির স্কন্ধে হাত রাখিতে গিয়াছিল। রাসমণি পিছাইয়া গেল, তাহার পর ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মহেন্দ্র এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। নানা চিন্তা মনে আসিতেছিল, তবে কি গুজবটা একেবারে সত্য? সত্য যদি হয়, তাহা হইলে রাসমণিরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মহেন্দ্র কি একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, মনোভাবের প্রতিবিম্ব মুখের প্রত্যেকটি রেখায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিল,—পিশাচ যেন তাহার সাধনার উপকরণের সন্ধান পাইয়াছে। মহেন্দ্র ফিরিল, তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি এক বিন্দু জলের জন্যও অপেক্ষা করিল না। কিন্তু জলের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবিল, একবার হরিদাসীর ওখানে যাইলে কেমন হয়? কিন্তু যাওয়া উচিত হইবে না। সেও তো কিছুদিন ধরিয়া মহেন্দ্রকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘটনাগুলি মহেন্দ্রের নিকট গোলমেলে হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া গন্তব্য পথের দিকে দ্রুত পা চালাইয়া দিল। সন্ধ্যার মধ্যে আবার থানায় হাজিরা দিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে কিছু অর্থ সংগ্রহ হওয়াও একান্ত দরকার।

(২)

রাসমণি

রাসমণি কবে এবং কোথায় জন্মাইয়াছিল, কেহ জানে না। দীর্ঘকাল প্রবাসে বাস করার পর হঠাৎ একদিন রাসমণির পিতা গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ভগ্ন কোঠাবাড়িটাকে রাজমিস্ত্রীর দল বাসোপযোগী করিবার জন্য পরম উৎসাহে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সাময়িক বসবাসের জন্য রামু গোয়ালা তাহার

আটচালা ছাড়িয়া দিয়াছে। এত বৎসরের একত্রিত খাজনা নবীন স্যাকরা (রাসমণির পিতা) নাকি এক দিনে সব টাকা দিয়া জমিদার ছোটকর্ত্তার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। অল্পদিনের ভিতরেই পরিত্যক্ত কোঠাবাড়িটি চকচকে ঝকঝকে হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে নবীন প্রচার করিয়া দিয়াছে, সঙ্গের মেয়েটি তাহার কন্যা। কন্যার মাতা বিদেশে মারা গিয়াছেন।

কোঠাবাড়ির নূতন ছাঁদ দেখিয়া সকলেই বুঝিল, নবীন বেশ পয়সা করিয়াছে। কারণ শুধু সে বাকি খাজনা চুকাইয়া দেয় নাই, এক লপ্তে চার শত বিঘা আবাদী জমি ইজারা লইয়াছে, আট জোড়া বলদ কিনিয়াছে, কামার-বাড়িতে নূতন হালের ফরমাস দেওয়া হইয়াছে, বাস্তভিটার পিছনদিককার ছোট পুকুরটাও আরও বড় করিয়া কাটানো হইতেছে।

বৎসর না পার হইতেই নবীন স্যাকরা গ্রামে একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিল। সামান্য ঘনিষ্ঠতার পরই গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা চিনিয়া ফেলিল, রাসমণি কে। মুখটি তাহার হুবহু ক্ষান্তর মত হইয়াছে, রং পাইয়াছে বাপের মত একেবারে পালিশ-করা আবলুস কাঠ। ক্ষান্তই যে রাসমণির মা তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

ক্ষান্ত, বাঁড়ুজ্জেদের সেই সোমত্ত বিধবা মেয়েটা, যাহার চরিত্রের জ্বালায় পাড়ার লোকেদের কোথাও মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। ওই ধিঙ্গী মেয়েটাই তো নবীন স্যাকরার সহিত পলাইয়াছিল। উহাদের দেখা-শুনা বন্ধ করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে কত রকম আলোচনা ও আয়োজন হইয়াছিল কিন্তু কেহই উহাদের সাক্ষাৎ ঠেকাইতে পারে নাই। তাহার পর কেলেঙ্কারি আর যখন লুকাইবার কিছু থাকিল না, তখন বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চীৎকার করিয়া ক্ষান্তর নাম ধরিয়া বলিয়াছিলেন, তুই যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যাস্ তো আমার মাথা খাস্। তুই আর এক দিন যদি এখানে থাকিস্, আমি গলায় দড়ি দোব। যতই ঢাকিবার চেষ্টা করুক, ক্ষান্তর দৈহিক গঠনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আর লুকানো যায় না। মায়ের প্রায় বৃদ্ধ বয়সে সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে, তিনি একই কারণে কন্যার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। মোটা লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া থান-পরিহিতা পূর্ণযুবতী কন্যাকে বলিলেন, তুই এ কি কাণ্ড করলি, আমার মুখ দেখাবার কিছু রাখলি না! কন্যা কোনও প্রতিবাদ করে নাই, কেবল মাতা ও নিজের দেহের তুলনা করিয়াছিল। এই ঘটনার পরের দিন ক্ষান্ত ও নবীনকে গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

নবীন গ্রামে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গত হইয়াছেন।

তাঁহার স্ত্রী ভিন্নগ্রামে ভ্রাতার একান্নবর্ত্তী পরিবারে রাঁধুনীর কাজও করেন,

রাসমণি

ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখাশুনাও করিয়া থাকেন। সে অনেকদিন হইয়া গেল। ক্ষান্ত,

নবীন ও বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথা এখন বড় একটা কেউ বলে না। কেলেঙ্কারি পুরাতন হইলে তাহার ঝাঁজ কাটিয়া যায়। ঝাঁজ না থাকিলে কেচ্ছার আলোচনায় তেমন আরাম পাওয়া যায় না, সেই কারণেই উহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে।

রাসমণি-সহ নবীন ফিরিয়া আসিতে দুই-চারিজন দিন কতক কানাঘুষা করিয়াছিল। কিন্তু বাড়ি, জমি ইত্যাদি দেখিয়া বুদ্ধিমানিরা এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। রাসমণি তখন কিশোরী—যৌবন সবে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সব কিছুর ভিতরই কেমন একটা নূতনের সাড়া পাইতেছিল মাত্র—কিন্তু নূতনকে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান, গোড়া হইতেই একটু বেশি রকম আদর পাইয়াছিল, অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছামত চলিত। গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমবয়স্ক ছেলেদের সহিত সে বালকের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইচ্ছামত বাড়িয়া উঠার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকিলেও দুঃসাহসিকতা ছিল। নিজের উচ্ছ্বাস সে দমন করিতে পারিত না। এই বয়সে অপর মেয়েরা অপরাহ্নে নিয়মিতভাবে প্রসাধনের নিমিত্ত গুরুজন-স্থানীয়াদের নিকট দেহ সমর্পণ করিয়া থাকে। চুলের গোছা লইয়া যখন পিসীমা, খুড়ীমা অথবা জননী পিছন হইতে প্রাণপণ শক্তিতে টান মারেন, তখন যন্ত্রণা উৎকট হইয়া উঠিলেও সহ্য করাটাই প্রসাধন সাফল্যের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। কোন মেয়েই এই সময়টিতে অবাধ্য হইতে সাহস পায় না, সৌন্দর্য্যের টীকা সুনিশ্চিত করিবার জন্য রাসমণির চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য কেহ ছিল না। তাহার যেদিন ইচ্ছা হইত চুল বাঁধিত, যেদিন ইচ্ছা হইত না ধূলায় ভরা এলো চুলে ঘুরিয়া বেড়াইত! কোন বকাটে ছেলে রাসমণির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন 'পাগলী' বলিয়া হাসিয়াছিল, রাসমণি বাম হস্তে অর্দ্ধভুক্ত কামড়-দেওয়া পেয়ারাটা লইয়া দক্ষিণ হস্তটা ব্যবহার করিয়াছিল একটি ভাল রকমের চড় কষাইবার জন্য।

চড় খাইয়া ছেলেটি ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে রাসমণির ত্রিসীমানায় আসে নাই। রাসমণি এই ভাবে একটা উগ্রগন্ধযুক্ত বনফুলের মত বাড়িয়া উঠিতেছিল।

অল্প সময়ের ভিতর বনফুলের তীব্র গন্ধ অনেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ফুলটি কণ্টকপূর্ণ, কেহ নিকটে আসিতে সাহস পাইল না। কিন্তু গন্ধটা যে চড়া, তাহা রসিকমাত্রেই মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

উপযুক্ত সময়ে নব-প্রস্ফুটিত বনফুলের বার্ত্তা বায়ুতে বহন করিয়া আনিল

নলিন স্বর্ণকারের নিকট। নলিন স্বর্ণকার জাতব্যবসায়ী; সোনা-রূপার গহনার দোকান আছে, এবং পুরাতন গহনার ব্যবসায়ের সহিত তেজারতির কারবারও চলে। ঋণীর দল আসল দিতে আসিলে বলে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই, এ তো ঘরের কথা, অসুখ আছে, বিসুখ আছে, আপনার টাকার প্রয়োজন কত, আমি কি আপনাদের পর? সামান্য যা সুদ হয়েছে, সেইটুকু দিলেই চলবে। ঋণগ্রস্তরা সবই বুঝিত, তথাপি একসঙ্গে অতগুলি টাকা ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। নলিনের উপদেশ মানিয়া লইত; সুদের ক্রমবৃদ্ধিতে নলিন হৃষ্ট হইয়া উঠিত।

নলিন লোকটা মোটের উপর মন্দ নয়। ব্যবসায়ী বুদ্ধি একটু বেশি রকম কড়া না হইলে সকলেই প্রাণ খুলিয়া বলিত, লোকটা চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ পুরুষ। কিন্তু গ্রামের গণ্যমান্য অনেকেই নলিন সরকারের নিকট ঋণগ্রস্ত, সুতরাং প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। নলিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ধারের কথা আগে মনে আসে।

অর্থ সম্বন্ধে যতই দুর্ব্বলতা থাক, নলিন যে চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ মানুষ— এ কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে। এত ভাল চরিত্র যে, বাড়িতে একটি সোমত্ত বয়সের ঝি পর্য্যন্ত রাখে না। এমন একটি মহাপুরুষের নিকট হইতে যখন রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাসমণির পিতা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পাইল না। নলিন ইতিমধ্যে দুই দুইবার পাণিগ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্য সারিয়া ফেলিয়াছে। রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব তৃতীয় বারের পালা। নলিনের পূর্ব্ববিবাহের ইতিহাস আছে, তাহা উপাদেয় না হইলেও এই গল্পের সহিত জড়িত।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নলিনের পিতা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে যাহারা বিবাহ করিত, তাহাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হইত না; অভিভাবকরা বিবাহ দিয়া দিতেন। নলিনের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই গৃহস্থালির সমস্ত ভার নলিন ও বউমার উপর চাপাইয়া নলিনের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। লোকে বলিল, বউটা সুলক্ষণা নয়, ঘরে না আসিতেই শ্বশুরকে খাইল। ইহা প্রথম পক্ষের বধূ শুনিয়াছিল। অভিযোগ করিবার কিছু নাই; কারণ সে জানিত, সনাতনপন্থীর বিচারে বাড়ির প্রাচীন অকর্ম্মণ্য ছাগলটি মরিলেও দোষ পড়িত বউয়ের উপর।

বিবাহের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। উভয়ে উভয়কে জানিবার সুযোগ ইতিমধ্যে যতটুকু পাইয়াছিল, তাহাই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবার পক্ষে

যথেষ্ট হইয়াছিল। গৃহস্থের বউ হইলেও তাহারও একটা সহ্যের সীমা আছে। এই সীমা একদিন অতিক্রম করিল। প্রথম পক্ষ বলিয়া ফেলিল, এ সংসারে বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল। আমি গেলেই সকলের হাড় জুড়োবে। যাচিত ঘটনাটি ঘটিতে বেশি দিন সময় লাগিল না। নলিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া প্রথম পক্ষ গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কতটা যন্ত্রণা পাইয়া সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। সকলে বলিল, অলুক্ষুণে বউ গেছে, বাঁচা গেছে। পুরুষমানুষের বিয়ের ভাবনা!

আদালতে যথাসময়ে মামলা উঠিল, দারোগা হইতে সকলেই বলিলেন, নলিনের মত সৎচরিত্রের মানুষ দেখা যায় না। নলিন নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইল। হাকিম রায় দিলেন—আত্মহত্যায় মৃত্যু; কারণ অজ্ঞাত।

এই ঘটনার পর মাত্র তিনটি মাস নলিন ধৈর্য্যকে ঠেকা দিয়া রাখিয়াছিল। ঘটকদের ঘন ঘন গতায়াত চলিতেছিল। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একদিন কন্যাদায়গ্রস্ত প্রপীড়িত একটি পিতাকে নলিন উদ্ধার করিয়া ফেলিল। বিবাহ এবার নিজের পছন্দমত হইয়াছিল। সবল সুস্থ বউ ঘরে আসিল। গৃহস্থালির কাজ ভালই চলিতেছিল; কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পায় নাই। নলিন আলাদা ঘরে শুইত। এই অকারণ ব্যবধানের প্রশ্ন মেজবউয়ের অন্তরকে কণ্টকের মত বিঁধিতেছিল, কিন্তু কখনও সে অভিযোগ করে নাই। বুক ফাটিয়া গিয়াছে, কারণটি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া লজ্জার কশাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া স্বামীর সামনে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। নিজেকেই প্রশ্ন করিয়াছে, কেন এমনটি ঘটিল? কেন তাহার নিজের স্বামীর নিকট যাইবার অধিকার নাই? যে মানুষ দিনের বেলা ভাষার আদরে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে, সেই মানুষই রাত্রির অধিকতর সুযোগ পাইয়াও এই স্বাভাবিক দূরত্ব সৃষ্টি করে কেন? স্বামীর আচরণ স্ত্রীর নিকট রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিল। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ অতি নিকট, ধীরে ধীরে মেজবউ হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

নলিনের ভাগ্যে ঘটনাচক্র সাংঘাতিকভাবে ঘুরিতেছিল। নলিন একদিন দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল, মেজবউ আঁস্তাকুড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকক্ষণ বোধ হয় হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেজবউ পাতকুয়ায় মাছ ধুইতে আসিয়াছিল, একটি বড় কই-কাঁটা হাতের মুঠার ভিতর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। কাঁটাটি তখনও হাতের নরম তালুতে বিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে।

নলিন পোদ-পিসিকে ডাকিয়া আনিল—পুরুষ কাহাকেও তো ডাকা চলে না, অঙ্গবস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। উভয়ে মাথায় বুকে জল দিতে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পোদ-পিসীকে সামনে দেখিয়া মেজবউ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। সমস্ত দেহ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। পোদ-পিসী জিজ্ঞাসা করিল, জল খাবে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল বউ?

মেজবউ পোদ-পিসীর কানের নিকট মুখ লইয়া বলিল, আমি এইখানে বড়দিকে দেখেছিলাম, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন, সাদা কাপড় প'রে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওই যে ওইখানটায়।—এতটা বলিয়া আলো-আঁধারিতে গোয়াল-ঘরটার দিকে তর্জ্জনীর দ্বারা দেখাইয়া দিল। নলিন ও পোদ-পিসী উভয়েই সেদিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, কিছুই নাই, কেবল ঝুমু গোয়ালার ছেঁড়া কাপড়টা লম্বা-লম্বি ঝুলিতেছে। কাপড়টি একটি বাঁশের উপর হইতে যে ভাবে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ঘোমটা-দেওয়া নারীমূর্ত্তির মতই লাগে বটে। কাপড়টা তুলিয়া আনিয়া নলিন মেজবউকে দেখাইল। কাপড় দেখিয়া মেজবউ একটু হাসিল, পোদ-পিসীর কাঁধে ভর দিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। পিসী কিন্তু কাপড় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। কানের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেপিলে হবে নাকি রে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। পিসী বিশ্বাস করিল না, গালে ছোট্ট একটি ঠোনা মারিয়া বলিল, মা হবি, তাতে লজ্জা কিসের বউ? উত্তরে মেজবউ প্রতি-বাদ করিবার জন্য আরও জোরে মাথা নাড়িয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পিসী নিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াছে, ছি, এ অবস্থায় সন্ধ্যেবেলা আঁস্তা-কুড়ে একলা যেতে আছে বাছা, তার ওপর আবার সঙ্গে মাছ নিয়ে গেছিস্! আর ওখানে একলা যাস নি। আড়ালে নলিনকে ডাকিয়া বলিল, বারদোষ লেগেছে, তার ওপর অপঘাত কিনা—দেখো, যেন বড়বউ ভর না ক'রে বসে। সন্তান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পিসী চলিয়া গেল।

নলিন রোয়াকটায় বসিয়াছিল, মেজবউ তাহার নিকটে আসিয়া কম্পিত গলায় বলিল, আমাকে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখানে সমস্ত দিন একলা থাকি, বড্ড ভয় করে। বড়দিকে এর আগেও দু-একবার দেখেছি, ঠিক তুমি যে রকম চেহারা বলেছিলে, সেই রকম। তখন কিন্তু আমাকে ডাকেন নি। আজ ওখানে মাছ ধুতে গিয়েই দেখলাম, গোয়াল-ঘরের দরজার সামনে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তারপর আমার

মনে হ'ল, তিনি বলছেন, দে-না, গলায় দড়ি দে, আমার কাছে চ'লে আয়, তোর সব দুঃখ্ ঘুচে যাবে। আরও হয়তো কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, নিতান্ত অসহায়ার মত নলিনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল, আমাকে বাবার ওখানে পাঠিয়ে দেবে ? নলিন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দুপুরবেলায় দাওয়ায় মেজবউ আপন মনে বসিয়া ছিল, হঠাৎ তাহার গলায় দড়ি দিবার কাতর আহ্বান মনে পড়িল। পরক্ষণেই অনুভব করিল, বড়বউ অদৃশ্যভাবে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতেছেন, আর কতকাল ভুগবি, সোমত্ত বয়েস নিয়ে আর কতদিন ভুগবি, গলায় দড়ি দে, তোর সব দুঃখ্ কেটে যাবে, আয় আয়, আমার কাছে চ'লে আয়।

মেজবউ উঠিল, দৃষ্টি তাহার সম্মোহিতের মত। যে ঘরে বড়বউ আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। শূন্য দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দেওয়াল দেখিল ; আর দেখিল যেখান হইতে বড়বউ ঝুলিয়াছিল সেখানটা। অনুমানে মেজবউ অতীতের সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ওই তো সেই দড়ি, এখনও তাহার খানিকটা অংশ বাঁশের সহিত আটকাইয়া আছে। কে বলিবে, উহা দড়ি নয়, উহা ঝুল, আবর্জ্জনা পরিষ্কারের অভাবে নিজের অস্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। মেজবউ দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কি কামনা করিল, তাহার পর জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পরের দিন নলিন নিজে অনাহূতভাবে মেজবউকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি উপস্থিত হইল। একটি গ্রামের পরেই নলিনের শ্বশুরালয়। নলিন না বলিলেও মেজবউয়ের পিতামাতা সব খবরই রাখিতেন। অসুস্থতার কারণ যখন অহেতুক জানিতে পারিলেন, তখন উভয়েই কন্যার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—সোমত্ত মেয়ে, কিছু যদি ঘটিয়া যায় !

কিছুদিন সহজভাবে কাটিয়া যাওয়ায় পিতামাতা উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছিলেন, রোগটা তাহা হইলে হয়তো সারিয়া যাইবে। অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে আসিতে পাইয়া মেজবউ বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিল। এই কারণে তাহাকে আগ্‌লানোর সাবধানতাও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। ভবিতব্যের উপর কাহারও হাত নাই। মাতা সেদিন কিছু আগে ঘাটে বাসন লইয়া গিয়াছিলেন, পিতাও তখন কর্ম্মস্থলে। এমনই সময় দেখা গেল, মেজবউয়ের বাপের বাড়িতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, হেঁসেলঘরের ছাউনি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণিকের ভিতর অগ্নি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছে গৃহস্থের আশ্রয়কে গ্রাস করিতে। গৃহদাহের বার্ত্তা অগ্নি নিজেই বহন করিয়া চলিল দ্রুত হইতে দ্রুততর

বেগে। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল বালতি ঘটি, যে যাহা সামনে পাইল, তাহাই লইয়া।

মেজবউয়ের মাতা পুকুরঘাট হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, আমার কি হ'ল গো, মেয়েটা যে ঘরের ভেতর রয়েছে। চীৎকার শুনিয়া দুই একটি সাহসী ছেলে হেঁসেলঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মেজবউ একেবারে উনানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, সব কাপড়ে তখনও আগুন লাগে নাই, কিন্তু পেটটা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। যখন মেজবউকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হইল, তখন তাহার দেহ প্রাণহীন অসাড়। সকলের চেষ্টায় আগুন নিবিয়া গেল। খবরটি যথাসময়ে নলিনের নিকট আসিয়া পৌছাইল। নলিন কাঁদিল না, স্তব্ধ হইয়া সংবাদটি গ্রহণ করিল। লোক সংগ্রহ করিয়া গোরুর গাড়িতে গমন করিল। চিতার সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি মেজবউয়ের বাকি অংশটুকুও উপযুক্ত সময় পুড়াইয়া দিল।

শ্মশানযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিয়া নলিনকে পরামর্শ দিল, ঘরটা ভাঙিয়া ফেল, তাহার পর ত্রিরাত্রি ওখানে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলে দোষ কাটিয়া যাইবে। একটা লোহার পেরেক দরকার, সেইটাই ডাইনীর কুনজর হইতে রক্ষা করিবে। নলিন এবার নিজেই একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কি জানি, গত দুইজনেই যদি তাহাকে তাহাদের পথ অনুসরণ করিতে বলে! শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজনকে তাহার সহিত বাকি রাত্রিটা থাকিতে বলিল। একজনের পরিবর্ত্তে সকলেই থাকিয়া গেল, কারণ পান এবং অনুপান উভয়েরই বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে ছিল। সমস্ত রাত্রিটা নলিন বাদে সকলে মিলিয়া হুল্লোড় করিয়া মেজবউয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিল।

দুই বৎসর হইতে চলিল, মেজবউ মরিয়াছে। রাসমণির বাড়ন্ত গঠনের কথা হাওয়ায় উড়িতেছে—যথাসময়ে তাহা নলিনের নিকট আসিয়া পৌছিল। ভোজনপ্রিয় হিতৈষীর দল উৎসাহিত হইয়া নলিনকে প্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল, আরে বাপু, কালো হ'ল তো কি হ'ল? অমন আলগা-শ্রী মেয়ে দেখেছ কোথাও? চেহারাটাই লক্ষ্মীমন্ত। হিতোপদেশের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অবশেষে নলিন ঠিক করিয়া ফেলিল, রাসমণিকে সে বিবাহ করিবে।

নলিনের মত একটী আদর্শ পুরুষ পরোপকারার্থে বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাসমণির পিতা শুভকার্য্যে কালবিলম্ব করিলেন না। বিবাহে স্ত্রী-আচার হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান ছিল, সবেতেই জামাই এবং শ্বশুর প্রাণ ভরিয়া খরচ করিল। বরপক্ষ উদর পূর্ণ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেল, বার বার তিনবার, এবার টিকে যাবে।

রাসমণি ফুলশয্যায় সমবয়স্কাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিল, খেলিয়াছিল, ফুল ছুঁড়িয়া নিজের বরকেই মারিয়াছিল। ইহা লইয়া বরপক্ষের দুই-একজন প্রাচীনা নিজেদের মধ্যে অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। রাসমণির কানে খবরটি আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, কিন্তু ভব্যতার সব আইন তাহার জানা ছিল না ; ভাবিল, উহা হয়তো এক রকমের রসিকতা। কয়েকটি বলিষ্ঠা মেয়ে রাসমণিকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া নলিনের ক্রোড়ে বসাইয়া দিল। রাসমণি কিছুমাত্র বাধা দিল না। রাসমণিকে তাহার সমবয়স্কারা চিনিত, কানে কানে কি বলিল। রাসমণি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, কি, আমি পারি না ? এই দেখ।

"এই দেখ", বলিয়া যাহা সে করিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজে অধুনা চলন হইলেও দেশী কোন নববধূ স্বামীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে সকলের সামনে তাহা করিতে পারিত না। রাসমণি বরের গাল টিপিয়া একটি গোটা চুম্বন করিয়া ফেলিল। চুম্বনের পরেই একজন সখীকে ডাকিয়া কানে কানে বলিল, ভাই, ওর মুখে বিচ্ছিরি গন্ধ। নলিন বহুদিন হইতে পাইওরিয়ায় ভুগিতেছিল। দাঁতের বেদনা অনুভব করিলেও গন্ধের খবর সে নিজেই জানিত না। কিশোরীর অর্থহীন চুম্বন প্রৌঢ় নলিনকে প্রেম-মদিরায় নিমজ্জিত করিয়া দিল। নলিনও হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাসমণিকে হৃদয়ের বাহির ও অন্তর স্পর্শ করাইয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। সার্কাসের ক্লাউন যেন নূতন খেলা আমদানি করিয়াছে। সকলেই বুড়া বরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটি। সকলের হাসির সহিত নলিনও যোগ দিল, যেন তারের যন্ত্রগুলি একসুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, একের ঝঙ্কারে অপরে বাজিতেছে।

রাত্রির গভীরতার সহিত ক্রমে আমোদের ঝঙ্কারও কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে দুইটি প্রাণী থাকিয়া গেল দুইজনের সহিত চিরপরিচিত হইবার জন্য।

নলিন উঠিয়া আলোটা কম-জোর করিয়া দিল। অভিজ্ঞতা তাহাকে অনেক কিছু শিখাইয়াছিল। বিবাহের পর প্রথম রাত্রি অসুবিধা ওত পাতিয়া থাকে। দরজার উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ শুনিল, কেহ আড়ি পাতিতেছে কি না। নলিন নিশ্চিন্ত হইল, কেহ নাই। ফিরিয়া আসিয়া রাসমণিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। মুখে, গালে, কপালে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। রাসমণির অদ্ভুত বোধ হইলেও ভাল লাগিতেছিল ; কেবল মুখটা অতি নিকটে আসিলেই গন্ধটা পছন্দ করিতেছিল না। নলিনের আদর পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, এমন সময় রাসমণি বলিয়া ফেলিল, তোমার মুখে অত বিচ্ছিরি গন্ধ

কেন? বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কাল এবং পাত্র হিসাবে অশোভনীয়। নলিনের সমস্ত প্রেমোত্তম এক মুহূর্ত্তে চুরমার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে দেহ ও মন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহার মুখে এ কি বাণী! তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসের বিনিময়ে এ কি প্রতিদান! নলিন কোন উত্তর দিতে পারিল না। ছোটদের সহিত হুড়ামুড়ি করিতে গিয়া প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া নিজেই এক গ্লাস জল ঢালিয়া খাইল; তাহার পর বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

রাসমণির চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। একলা ঘরে সে বসিয়া আছে, অপরিচিত পুরুষের পাশে। ঝিমানো আলোতে যে আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিল, রাসমণির কাছে তাহা নুতন অভিজ্ঞতা। নূতনের ভিতর কেমন একটা মাদকতা ছিল, রাসমণি তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছিল। তাহারও উচ্ছ্বাস আসিতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশ তাহার জানা ছিল না। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন নলিনের গোঁফটা একটু টানিয়া দেখিল। মুখের কাছে আসিয়া কি করিতে যাইতেছিল, দুর্গন্ধের কথা মনে পড়িতেই নিজেকে সংযত করিয়া লইল। রাত্রি আরও গভীর হইয়া আসিতেছিল, প্রেমোন্মত্তার নিকট নিস্তব্ধতা প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে, রাসমণি আবার নলিনের চিবুকে হাত বুলাইল। নলিনের তখন নাক ডাকিতেছে।

নলিনকে তাহার ভাল লাগিল, মনে মনে ভাবিল, এ আমার বর, আমার নিজের বর। অন্তরে উপলব্ধি করিল, এ দাবিতে কেহ ভাগ বসাইতে আসিবে না। উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর একবার নলিনের গালে হাত দিয়া তাহারই পাশে, অতি নিকটে শুইয়া পড়িল।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রাসমণি এখন পূর্ণ যুবতী। কিন্তু সন্তানের মা হইবার সৌভাগ্য এখনও সে পায় নাই। পোদ-পিসী, রামুর মা ইত্যাদি পাঁচু-ঠাকুরের মাদুলি হইতে: আরম্ভ করিয়া পীরবাবার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাসমণি কোনটাই ব্যবহার করে নাই। সে জানিত, ঔষধ ব্যবহারে কোন লাভ নাই।

যতই যৌবন রাসমণিকে চারধার হইতে ঘিরিতে আরম্ভ করিল, ততই নলিন বধূকে খুশি করিবার জন্য নিত্য নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে থাকিল। ভাষাও নিত্য নবরসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সংক্ষেপে রাসমণির জন্য আদরের ভাষা লইয়া নলিন সর্ব্বদাই, প্রস্তুত বলিব না, তটস্থ হইয়া থাকিত। নলিন যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাণের কথাকে নানা রূপ দিয়া প্রকাশ করিবার

চেষ্টা করে, ততই সে অনুভব করিতে থাকে, তাহার মনোভাব প্রকাশ হইতেছে না, কোথায় কিসের অভাব থাকিয়া যাইতেছে, সে অভাব পূর্ণ করিবার শক্তি তাহার নাই।

এই ভাবে রাসমণি ও নলিনের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। রাসমণি এখন মনকে আব্রু দিয়া বেড়ায়। সাবধানতার দৃঢ় দেওয়াল আব্রুকে অভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। নলিন জানিতেও পারে না, তাহার প্রেম-নিবেদনের উৎকোচ রাসমণি আড়ালের পিছন হইতে কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে।

রাসমণি খোলা বাতাসের জন্য হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। পাড়া ঘোরা তাহার অভ্যাস নাই। দীর্ঘকাল সে স্বামীগৃহে আটক পড়িয়াছে, অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এতই অস্বাভাবিক যে, গৃহ এখন পিঞ্জরের মতই অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ সংসার ধর্ম্মের ফাঁকা কর্ত্তব্যগুলাই এখন তাহার নিকট জীবনযাপনের অবলম্বন। সন্তরণপটুতায় রাসমণি এককালে তাহার গ্রামের মধ্যে নাম করিয়াছিল। বহুদিন সাঁতার কাটে নাই; ভাবিল সাঁতারের অছিলায় অন্তত কিছুক্ষণ যদি গৃহের বাহিরে থাকিতে পারে, হয়তো কিছু শান্তি পাইবে।

নলিনকে বাবুদের পুকুরে স্নানের আবেদন জানাইল। নলিন আপত্তির কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না, বরং আনন্দিত হইয়া রাসমণিকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

রাসমণির একঘেয়ে জীবনযাত্রায় নূতন সুরের সাড়া পাওয়া গেল বাবুদের পুকুরঘাটে, তুচ্ছ কয়েকটি সূত্র অবলম্বন করিয়া।

বেলা পড়িয়া আসিলে রাসমণি একলাই এখানে স্নান করিতে আসিত। নানাভাবে সাঁতার কাটিয়া পুকুরটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিত। কখনও চিত, কখনও বুক, কখনও এড়োভাবে সাঁতার কাটিয়া অদ্ভুত কৌশলে এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইত এবং এতটুকু বিশ্রাম না করিয়া ফিরিয়া আসিত। কখনও পুকুরের মধ্যস্থলে হস্তপদ চালনা বন্ধ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডের মত অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। সন্তরণ পারদর্শিতায় রাসমণি নিজেই খুশি হইয়া উঠিত। বয়সের কথা ভুলিয়া যাইত, ভুলিয়া যাইত—সে একজনের পত্নী এবং স্থানটি শ্বশুরবাড়ির পার্শ্বে, এখানে ছেলেমানুষি করিলে লোকে নিন্দা করিবে।

রাসমণি জানিত না তাহার সন্তরণপটুতার তারিফ করিবার জন্য আর একজন

দর্শকও সেখানে উপস্থিত থাকিত, এবং অন্তরাল হইতে শুধু তাহার সাঁতারের তারিফ করিত না, অঙ্গসঞ্চালনে দেহের লীলায়িত রেখাগুলিও সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিত। দর্শক রসিক ও ঘোরতর বাস্তববাদী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহা সে প্রাণ ভরিয়া পাইতে ভালবাসিত। নীতিবদ্ধ সংস্কার কখনও এই ভোগ-লিপ্সায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সত্ত্বগুণ আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মাটির রজ ও তমোগুণকে চাপিয়া মারে নাই। তাহার আত্মতুষ্টির মহামন্ত্র ও সাধনাই ছিল যাচিত বস্তুটি পাওয়া এবং ইচ্ছামত ভোগ করা। দর্শক আমাদের প্রিন্স্ মহেন্দ্র। জলকেলির প্রদর্শনী দেখিয়া মহেন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পেশাই সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া এবং সব বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে পাওয়া। মহেন্দ্র রাসমণিকে পাইবার জন্য তাহার জাল পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুদিন বাদে দর্শক অদৃশ্য স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিল। সর্ব্বশরীর সিক্ত করিয়া রাসমণি যখন সিঁড়ির চাতালে স্বচ্ছ বস্ত্র সংযত করিত, সেই সময় শুনিত আমগাছটার নিকট হইতে ছোট্ট একটি কাসি। শব্দ অনুসরণ করিলেই রাসমণি দেখিতে পাইত, মহেন্দ্র গাছের গোড়ায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখে কূট হাসি—সে হাসির অর্থ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে পাশবিক কিংবা প্রাণস্পর্শীও মনে হইতে পারে,—অর্থগ্রাহীর সাময়িক মনের অবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করে।

হাসির কেন্দ্র ছাড়াইয়া চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয়, মহেন্দ্রের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ রাসমণির গঠনের উপর। চাহনির তীব্র লালসাপূর্ণ মারণোন্মুখ সঙ্কেত অস্বস্তিকর হইলেও ঠিক অবাঞ্ছনীয় বলা চলে না। কাসির শব্দ রাসমণির মনে যে প্রকারেরই প্রতিধ্বনি তুলুক না কেন, বাহ্যিক প্রকাশে কোনরূপ অসমর্থন ছিল না।

কাসির সঙ্কেত যখন একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝুঁকিতেছিল, সেই সময় রাসমণি সংস্কারের খোঁচা খাইয়া কিছুদিনের জন্য পুকুরঘাটে স্নান করা বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনার পর রাসমণি নিজের শক্তিকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর পাইয়াছিল। কিন্তু মনের গুপ্ত কোণ যে জালের প্যাঁচে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশিদিন রাসমণির নিকট অজ্ঞাত থাকিল না।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কই, এই ধরনের চাঞ্চল্য কখনও তো সে অনুভব করে নাই! পুকুরঘাটে যাইবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিতেছে কেন? পুরুষের মুখশ্রী কঠোর, তথাপি উহা পুরুষোচিত এবং সুন্দর।

মহেন্দ্রের দীর্ঘ ও সুঠাম গঠন রাসমণির সত্যই ভাল লাগিয়াছিল। এই ভাল-লাগাকে অস্বীকার করিবার জন্য সে স্বামীগৃহে নিজেকে আবার বন্দিনী করিয়া ফেলিল, মনের চতুষ্পার্শে নীতির বেড়া দিয়া নিজেকে আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে আবেষ্টনীতে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় বরণীয় করিয়া লইতে চাহিল।

রাসমণি গৃহে ফিরিয়া ভাবিতে থাকে পুকুরঘাটের কথা এবং অহরহ নিজের আচরণকে তিরস্কার করে, কিন্তু ঘটনাগুলির আকর্ষণ হইতে মুক্তি পায় না। একটির পর একটি চলচ্ছবির মত তাহার দৃষ্টিপটে উদয় হইতে থাকে, প্রথম দিনের ঘটনা তাহার গৌরবর্ণে উদ্দীপ্ত পদযুগল দেখিবার জন্য—কেমন করিয়া সে পায়ে কাঁটা ফুটাইয়াছিল এবং নীচু হইয়া মাথার কাপড়ের আড়াল হইতে কি ভাবে সুন্দর পা দুইটি দেখিয়া লইয়াছিল! দ্বিতীয় দিনে অকারণ পূর্ণ কুম্ভকে পুনরায় জলপূর্ণ করিবার নিমিত্ত কেমন করিয়া সে মাঝপথ হইতে ফিরিয়া আবার পুকুরঘাটে নামিয়াছিল এবং চকিতে ঘোমটার আড়াল হইতে আড়চোখে মহেন্দ্রের সমস্ত মুখখানি দেখিয়া লইয়াছিল। তৃতীয় দিনের কথা, তখন মাথার কাপড় ছিল না—কি ভাবে উভয়ের দৃষ্টির বিনিময় হইয়াছিল, ভাবিতে রাসমণির পুলকমিশ্রিত শিহরণ আসিল। রাসমণি জানিত, মহেন্দ্র তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে, তথাপি লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাকে না দেখিয়া পারে নাই। রাসমণি নিজের কাছেই নিজে হার স্বীকার করিয়াছে; জাগ্রত মনকে স্তোক দিয়াছে এই বলিয়া—ও যে সুন্দর, আমি কেবল সুন্দরকে দেখিয়াছি, আর তো কিছু করি নাই। কিন্তু চোখের মিলনের সহিত দৈহিক মিলনাকাঙ্ক্ষাও জড়াইয়াছিল এবং তাহার আকর্ষণ যে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে—এ কথা সুপ্ত মন দৃঢ়ভাবে প্রচার করিলেও জাগ্রত মন তাহা প্রকাশ্যে মানিয়া লইতে পারে নাই। দ্বন্দ্ব চলিল সুপ্ত ও জাগ্রতের মাঝে। পরিণাম কি হইবে, রাসমণি তখন জানিতে পারে নাই। পুকুরঘাট পরিত্যাগ করিয়া মনে সে যথেষ্ট বল পাইয়াছে, তথাপি ভাবিতে থাকে, তবে কি সে ভ্রষ্টা হইতে চলিয়াছে। অসম্ভব, সতীর ইহ ও পরকালের অবলম্বন একটি অপরিচিত ব্যক্তির লোলুপ দৃষ্টিতে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে? অসম্ভব। আরও অনেক অসম্ভবতার সান্ত্বনা রাসমণিকে কোনপ্রকারে পদস্খলন হইতে ঠেকা দিয়া রাখিয়াছিল। রাসমণি অনির্ভরশীল ঠেকাকেই আশ্রয় মনে করিল, ভাবিল, হউক সে সুদর্শন, তবু সে নীচ উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, রাসমণি তাহাকে ঘৃণা করিবে। ঘৃণাও যে আকাঙ্ক্ষার একটি ভিন্ন রূপ,

রাসমণি তাহা জানিত না ; সে আত্মতুষ্টি লাভ করিল, মহেন্দ্রকে ঘৃণা করে বলিয়া। যখন সে ঘৃণাই করে তখন পুকুরঘাটে যাইতে দোষ কি আছে? তা ছাড়া ফাঁকার মাঝে সে আমার কি অনিষ্ট করিতে পারে?

সেদিন রাসমণি পুকুরঘাটে যাইবে ঠিক করিয়া ফেলিল, মহেন্দ্রের উৎপাত হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য মনকে কড়াভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সকাল হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল, সময় আর কাটিতে চায় না। বেসন ও হলুদ মুখে মাখিয়া কালো রঙকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। দর্পণ বহুদিন ব্যবহার করে নাই। কুলুঙ্গি হইতে সেটাকে নামাইল, পরিষ্কার করিয়া নিজের মুখ নানা দিক হইতে দেখিল। ভিজে গামছা দিয়া আবার মুখ মুছিল। খোঁপাটা ভাল করিয়া চাপিয়া দিল—তাহার পর লাগাইল চোখের কোলে কাজলের রেখা। সিন্দুর পরিল—চিরুনির ডগা দিয়াই দাগ পড়িল একটি সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ের মত। অন্যান্য দিন কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারাই সিঁদুর পরার কর্ত্তব্যটি সারিয়া লইত। দেহ-বস্ত্রেরও নূতনত্ব ছিল, কাপড়টা ঘাটে যাইবার মত নয়। একেবারে ধোপদোরস্ত ঢাকাই, যাহা পল্লীগ্রামে ক্রিয়াকর্ম্ম না থাকিলে কেহ পরে না। রাসমণির ঘৃণা দিগ্বিজয়ী হইতে চলিয়াছে। বেলা পড়িতে তখন দণ্ডাধিক বাকি—রাসমণি ঘরের ভিতর অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। দুইবার রোয়াকটা পায়চারি করিয়া আসিল। সময় আর কাটিতে চায় না, অবশেষে ভাবিল, একটু না হয় আগেই পুকুরঘাটে গেলাম, হয়তো পোদ-পিসীর এখন গা-ধোয়া শেষ হয় নাই, ও বাড়ির ছোটবউটা পিসী সঙ্গে না থাকিলে ঘাটে যায় না, সে হয়তো এখন ঘড়াটা মাজিতেছে, কেন বাপু, অতক্ষণ ধরিয়া ঘড়া না মাজিলে কি তোর চলে না, রাখিবি তো ঘরের ভিতর, তা এত মাজাঘষা কেন? রাসমণি আর নিজেকে ঘরের ভিতর আটক করিয়া রাখিতে পারিল না। ঘড়াটি কাঁকে রাখিয়া কাচা গামছা তাহার উপর ফেলিল। তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মাঝ-পথে আসিয়া ভাবিল, যদি ছোটবউ আর পিসীর সহিত দেখা হইয়া যায় তো তাহারা বেশের পারিপাট্য দেখিয়া কি বলিবে! বলিবার কি আছে! মানুষের কি শখ থাকিতে নাই! পিসী এবং ছোটবউ যদি সেখানে থাকে, এবং সে যদি চোখের সামনে পড়িয়া যায়, তখন রাসমণি কি করিবে? মহেন্দ্রের কথা ভাবিতেই হৃদয়ে একটা স্পন্দন অনুভব করিল, সে স্পন্দন ভীতি ও আনন্দকে একই সঙ্গে নাড়া দেয়। রাসমণি নিজেকে ধিক্কার দিল, ছি, চরিত্রহীনের কথা ভাবিতে আছে!

নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই রাসমণি পুকুরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিসী ও ছোটবউ ঘাটে নাই। রাসমণি বেশ শব্দ করিয়াই ঘড়াটা বাঁধানো ঘাটের

উপর রাখিল। তাহার পর ঘৃণার পাত্রটিকে দেখিবার জন্য আমগাছটার দিকে তাকাইল। মহেন্দ্র আসে নাই। ভাবিল, এখন তাহার আসিবার সময় হয় নাই।

রাসমণির বয়স কমিয়া গিয়াছে। উঁচু পাড় হইতে কোমর বাঁধিয়া ঘাটের কিনারায় লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর এক ডুবে প্রায় পুকুরের মাঝখানে গিয়া উঠিল। জলের উপর মাথা তুলিতেই আমগাছটা যেন তাহার দৃষ্টিকে টান মারিয়া মহেন্দ্রকে খুঁজিতে বলিল—কই, সে তো এখনও আসে নাই? না আসুক, তাহাতে রাসমণির কি!

সাঁতারের যত রকম কৌশল রাসমণি জানিত, কোনটাই বাদ দিল না। এতক্ষণে অপরাহ্ণ পার হইয়া গিয়াছে। রাসমণিও ক্লান্ত হইয়া আসিতেছিল, মহেন্দ্র তখনও অনুপস্থিত। রাসমণির আটচালা হইতে বাবুদের পুকুরঘাট বেশ খানিকটা দূরে, সুতরাং এখানে আর একলা থাকা ঠিক হইবে না। রাসমণি ঘাটে আসিয়া উঠিল। কলসীটায় দুইবার জল ভরিল, দুইবার তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার পূর্ণ করিয়া লইল। সন্ধ্যার ঘোরালো ছায়া তখন পুকুরঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। রাসমণির অনুসন্ধিৎসু চোখ দুইটি চতুষ্পার্শে মহেন্দ্রকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব কোথাও নাই। রাসমণি ক্লান্ত শরীর লইয়া বাড়ি ফিরিল।

রাসমণির প্রসাধনের নূতনত্ব দেখিয়া নলিন কৌতূহলী হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, আজ কি আমার কপাল ফিরিল নাকি? রাসমণি কোন উত্তর না দিয়াই হেঁসেল-ঘরে ঢুকিয়া গেল। সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হেঁসেল ঢুকিয়াই খোঁপাটা টান মারিয়া খুলিয়া ফেলিল, পুকুরঘাটে যাইবার পথে একটি লাল বনফুল খোঁপায় লাগাইয়াছিল, খোঁপা খুলিতে মাটিতে ফুল পড়িয়া গেল। রাসমণি তাহা দেখিল। হেঁসেলে ফুল মানায় না—পা দিয়া সেটাকে থেঁত্‌লাইয়া দিল, থেঁত্‌লানোর পরও দুইটি পাপড়ি ছিটকাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। রাসমণি তাহাদের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সজোরে দুইটা পাপড়িকেও পায়ের তলায় ঘসিয়া মাটির সহিত মিলাইয়া দিল। বিরক্তি ক্রমান্বয়ে রাগে পরিণত হইল। রাসমণি ঘড়াটা আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নলিনকে বলিল, আমি অত ভারী ঘড়া বইতে পারি না, কাল সকালেই নতুন ঘড়া কিনে দিও! ঘড়াটা হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেল, অত ভারী ঘড়া মেয়েমানুষে বইতে পারে নাকি?

রাসমণি এ বাড়ির গৃহলক্ষ্মী হইয়া আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ঘড়াটি নলিনের ঘরে স্থান পাইয়াছিল এবং কোন পক্ষের বধূই এই ঘড়ায় জল তুলিত না।

রাসমণির পক্ষে জলপূর্ণ ঘড়াটি বহন করা তুচ্ছ ব্যাপার, তথাপি উহা ভাঙিল

এবং নূতন ঘড়ার প্রয়োজন হইল। নূতন একটি কিনিয়া দিতে নলিনের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না ; কিন্তু রাসমণির উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিল, একটা কিছু ঘটিয়াছে। কারণ রাসমণির চরিত্রে উগ্র ভাব ক্বচিৎ দেখা গিয়াছে, স্বভাবতই সে উদাস।

নলিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গো ?

রাসমণি কোন উত্তর দিল না। হেঁসেলে ফিরিয়া গেল রান্নার ব্যবস্থা করিতে।

পরের দিনের ঘটনা! রাসমণি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল আর পুকুরঘাটে যাইবে না। সমস্ত দিন একলাই ঘরটিতে কাটাইয়া দিল। দ্বিপ্রহরের উগ্র রৌদ্র স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, অপরাহ্ণ আগত-প্রায়—মৃদু হাওয়ার দোলায় বেলফুলের বয়স-কমানো গন্ধ রাসমণির মনে অকারণ কিসের আলোড়ন তুলিয়াছে। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, বৈকালের ঠাণ্ডা বাতাসের স্নিগ্ধ আবেশ রাসমণির লাগিতেছিল ভাল—মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল পুকুরঘাটে যাইবার জন্য, আকর্ষণকে খর্ব্ব করিবার জন্য রাসমণি সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে, জীবনে আর কখনও সে পুকুর-ঘাটে যাইবে না। অপরাহ্ণ ধীরে সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, সে অস্থির হইয়া উঠিল। অস্থিরতার কারণ কি, সে জানে ; কিন্তু সঙ্কল্পকে অমান্য সে করিতে চাহে না!

পলে পলে সময় কাটিতেছিল, রাসমণির ঘরের ভিতর বন্দিনী হইয়া থাকা আর সম্ভব হইল না ; ভাঙা ঘড়াটা লইয়া আলুথালু বেশে পুকুরঘাটের দিকে রওনা হইল।

তখন পুকুরঘাট আলো-আঁধারিতে মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। বনফুলের উগ্র গন্ধ খোলা বাতাসের সহিত মিশিয়া মনকে মাতাল করিয়া তুলিতে চায়। রাসমণি আবেষ্টনীর মাঝে নিজেকে বিলাইয়া দিল।

ঘড়াটার তলা ফুটা হইয়া গিয়াছে, তথাপি ফুটা ঘড়া লইয়াই রাসমণি নামিল! সামান্য জলের আওয়াজ হইতেই শুনিল সেই পরিচিত কাঁসির শব্দ। মাথাটা খোলা ছিল, কাপড় টানিয়া দিল, তাহার পর আড়চোখে দেখিল, মহেন্দ্র যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে নিতান্ত কৃপাপ্রার্থীর মত। রাসমণি নিজেকে প্রশ্ন করিল, কাহার কৃপা চায় সে ? রাসমণির ? রাসমণি কতটুকু দিতে পারে ? দেহ ও মন নিজের হইলেও দান করিবার অধিকার তো তাহার নাই। সে যে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া নিজেকে বহুদিন আগে বিকাইয়া দিয়াছে—দেহ ও মন যে তাহার স্বামীর। হঠাৎ তাহার বিবাহের পরের দিনের কথা মনে পড়িল, যে দিন নলিনকে ভাবিয়াছিল, নলিন তাহার স্বামী, মানুষটির দেহ মন সব কিছুই তাহার নিজের। আজ কেন সে এত বড় দাবি ছাড়িয়া দিতেছে ? মনে মনে সান্ত্বনা

পাইল এই ভাবিয়া যে, স্বামী তো দাবি বজায় রাখিবার জন্য স্বামীর কর্ত্তব্য করে নাই। এমন সময় শুনিল, আবার সেই কাসি। শব্দটির ভিতর মন্ত্রশক্তি ছিল, রাসমণি স্থির থাকিতে পারিল না—শক্তিমান পুরুষকে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল, ডাগর দুইটি চোখ বুভুক্ষুর মতই মহেন্দ্রের রূপকে গ্রাস করিতেছিল। চোখের ভাষা উভয়ের মনকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। রাসমণি কিন্তু সংস্কারের প্রাচীর পার হইতে পারিল না, কোন প্রকারে মাথাটায় জলের ছিটা দিয়া শূন্য কুম্ভ লইয়াই উঠিল। কিন্তু শূন্যকুম্ভসহ গৃহস্থের গৃহে ফিরিতে নাই—রাসমণি ফুটা ঘড়াটাই ভরিয়া লইল। ঘড়ার আকৃতি বৃহৎ, মহেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। নির্ভীক প্রেমের রাজা আমগাছতলা ছাড়িয় ারাসমণির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রকে অত নিকটে আসিতে দেখিয়া রাসমণি অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, কিন্তু আপত্তির কোনরূপ বাহ্যিক প্রকাশ পায় নাই।

অত্যন্ত বিনীত ভাষায় মহেন্দ্র বলিল, এত বড় ঘড়া বইতে আপনার কষ্ট হবে। এখন এখানে কেউ নেই, আমি আপনার ঘড়াটা আপনাব বাড়ির কাছাকাছি পৌছে দোব? কেউ জানবে না। আপনার একটু কষ্ট লাঘব হবে।

'আপনি' বলিয়া রাসমণিকে কখনও কেহ সম্বোধন করে নাই। রাসমণি খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে। শুদ্ধ ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইয়া রাসমণি গলিয়া গেল। ভাষার প্রভাব রাসমণি অস্বীকার করিতে পারে নাই, ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল, তাহার পর ঘোমটা আরও বাড়াইয়া দিয়া চলিতে লাগিল। মহেন্দ্র আর অগ্রসর হইল না। দেখিতে লাগিল গমনশীল ভাস্কর্য্য, ফুটা ঘড়ার জলে কাপড় সিক্ত হইয়া গিয়াছে। অপূর্ব্ব নিতম্বের নৃত্য। গঠনটি যেন একটি প্রাচীন দেশী খোদাই-করা মূর্ত্তির, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিয়া চলিয়াছে। দেহের পূর্ণতা নিখুঁত। এমনই একটি সুন্দরী দুর্ব্বলভোগ্যা হইতে পারে না। মহেন্দ্র ভাবিল, নীতি ও রাজার আইনে যে ব্যবস্থাই থাকুক, ওই স্বাস্থ্যবতীকে ভোগ করিবার অধিকার মহেন্দ্র ছাড়া আর কাহারও নাই। যাহাদের পুরুষোচিত শক্তি নাই, তাহাদের আইন করিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এই শক্তিময়ী যুবতীর পতি কিনা নলিন! মহেন্দ্র কোন বিচারেই ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতে পারিতেছিল না। যে লোকটা আজীবনকাল অজীর্ণতায় ভুগিতেছে, যাহার জন্ম হইয়াছে রোগ ভুগিবার জন্য, সে কোন্ অধিকারে, সুস্থ মানুষের দেহ ও মন কলুষিত করিতে চায়? মহেন্দ্রের বজ্রমুষ্টি নিষ্পেষিত হইতে লাগিল, নীতিবাদী কেহ নিকটে থাকিলে তাহার বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত।

নীতি অর্থে মহেন্দ্র বুঝিত সমাজরক্ষার্থ কতকগুলি আইন। সে ভাবিল, এই

আইনই ব্যভিচারের ভিন্ন নাম লইয়া পাপ ও পুণ্যের আকারে আমাদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইতেছে। সত্য কঠিন হইলে তাহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি মরিয়াছে। আইনের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। মহেন্দ্র নিজেই এই পথের পথপ্রদর্শক হইত, কিন্তু সাধুদের দল তাহাকে মানিবে না, কারণ তাহাদের বিচারে মহেন্দ্র স্খলিতচরিত্র, এবং দলে তাহারা ভারী।

রাসমণি মহেন্দ্রের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র পুকুরঘাটে আসিয়া বসিল। চিন্তাস্রোত নানা দিকে ঘুরিতেছিল, কিন্তু রাসমণিই ছিল তার মুখ্য কেন্দ্র। এ রকম পরিপূর্ণ যৌবন এবং নিখুঁত গঠন কখনও সে দেখে নাই। গ্রামের মেয়ে এত সুন্দরী হয় কেমন করিয়া, মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া পড়িল। সন্ধ্যায় থানায় গিয়া দারোগার সহিত কিছুক্ষণ রসিকতা না করিলে আইনের অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণে তাহাকে বাঁধা পড়িতে হইবে। মহেন্দ্র চলিয়া গেল থানায় হাজিরা দিতে।

কিছুদিন বাদের ঘটনা। রাসমণি সপ্তাহকাল পরে ঘাটে আসিল, যে কারণে প্রথমবার পুকুরে স্নান করা বন্ধ করিয়াছিল, এবারের কারণও ঠিক তাহাই। রাসমণি মহেন্দ্রকে দেখিতে চায় না, কিন্তু না দেখিয়াও ঘরে থাকিতে পারে না, তাই নূতন-কেনা কলসী লইয়া আবার সে ঘাটে আসিয়াছে। মহেন্দ্রের যেন দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছিল, রাসমণি কোথায় কখন কি করিতেছে, অদৃশ্য থাকিয়া সব দেখিতে পাইত। কোন অশরীরী যেন সন্ধান দিয়া গিয়াছিল, রাসমণি আজ ঘাটে আসিবে। প্রথম দিনে কথা বলার পর মহেন্দ্রের কাসিবার প্রয়োজন হয় নাই।

রাসমণি আজ মহেন্দ্রের সামনেই সাঁতার কাটিল, বেশিক্ষণ নয়। সিঁড়ির ঘাটে উঠিবার সময় উন্নত বক্ষের উপর পরতের পর পরত কাপড় ফেলিল,—তাহাতেও যেন লজ্জা বাগ মানিতে চায় না, সর্ব্বোপরি গামছাটা দিয়া বুক পিঠ ঢাকিয়া দিল। পূর্ণ কুম্ভ কাঁকে আসিয়া উঠিল, সমস্ত দেহটাকে প্রাণ-মাতানো রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া জড়াইয়া ধরিল। মহেন্দ্র বিভোর হইয়া দেখিতেছিল। মহেন্দ্র আজ স্থান ত্যাগ করে নাই। রাসমণির ইহা ভাল লাগিল না। জলপূর্ণ কুম্ভটি পরীক্ষা করিয়া সমস্ত জল ফেলিয়া দিল, তাহার পর আবার ফিরিল জল ভরিবার জন্য। ঘাটে পুনরায় নামিবার সময় এমন ভাবেই আকাঙ্ক্ষিত জীবটির দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল, যাহার অর্থ কৃপা-প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না।

জল ভরা হইয়া গিয়াছে, মহেন্দ্রও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রাসমণির ফিরিবার পথের উপর। রাসমণি ছোট কলসীটি তুলিয়াই যেন ভারাক্রান্ত হইয়া

পড়িতেছিল। মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, কলসীটা আমি খানিকটা নিয়ে যাই না—এখানে কেউ নেই, আমবাগানে এ সময় কেউ থাকে না। সন্ধ্যের দিকে সময় সময় বাঘ আসে, জানেন না? রাসমণি কলসীটি ঘাটেই রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাকে ভয় করছেন? রাসমণির নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতে যাইতেছিল। রাসমণির মুখ হইতে একটি ছোট্ট 'না' শব্দ বাহির হইয়া আসিল। মহেন্দ্র দাঁড়াইল রাসমণির অতি নিকটে। রাসমণি তখনও কলসীটি তুলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। মহেন্দ্র ইহাই চাহিয়াছিল, যেন বশীকরণ-শক্তির দ্বারা মহেন্দ্র রাসমণিকে নির্ব্বাক ভাষায় আদেশ করিতেছিল তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবার জন্য। মহেন্দ্র আরও নিকটে আসিয়া রাসমণির হাত ধরিল পরম সুহৃদের মত। স্পর্শমাত্র রাসমণি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—মহেন্দ্রের আচরণ অসমর্থন করিয়া নয়, একটি ঈপ্সিত ও ভীতিপ্রদ পুলকের শক্তিময় প্রভাবে। একবার হয়তো নিজের হাতটা মুক্ত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টার ভিতর কোন আন্তরিকতা ছিল না, মহেন্দ্রের নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকিল না। সুযোগ-অনুসন্ধানী শিকারী হাত ছাড়িয়া অতি সন্তর্পণে কাঁধে হাত রাখিল। রাসমণি বাধা দিল না, মহেন্দ্র নিজের মুখ রাসমণির কানের কাছে লইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক তুমি আমাকে ভয় কর? মহেন্দ্রের উত্তপ্ত নিশ্বাস রাসমণির কর্ণের এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, মনে হইতেছিল, এখনই মহেন্দ্রের ওষ্ঠ রাসমণির কর্ণ স্পর্শ করিয়া ফেলিবে। রাসমণির মুখে ভাষা নাই, কিন্তু হৃদয় এমন ভাবেই আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাহিরে তাহার দোলা প্রত্যক্ষ করা চলে!

মহেন্দ্র এবার গাঢ়ভাবে রাসমণিকে আলিঙ্গন করিল। এক মুহূর্ত্তে এতদিনের সংস্কার প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। মহেন্দ্রের বিশাল বক্ষের উপর রাসমণি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, উত্তেজনার চরম লক্ষণ সব বাধা অতিক্রম করিয়া রাসমণির মনের কথা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়া দিল। রাসমণি ধরা পড়িল। যে অভাব রাসমণিকে এতদিন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছিল, তাহারই পূর্ণ মোচন ঘটিল—সর্ব্বনাশা কাম-প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া। ধর্ম্ম, নীতি ও সংস্কারের ভস্মীভূত স্তূপ মাথায় করিয়া রাসমণি বাড়ি ফিরিল।

ইহার কিছুকাল পরের ঘটনা। রাসমণি পুত্রসন্তানের মাতা হইয়াছে। পোদ-পিসী বলিলেন, দেখলে তো, আমার পীরঠাকুর কি রকম জাগ্রত, শুধু তাকে স্মরণ করাতেই আমাদের রাসমণি—

কথাটা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবার আগেই পিসীর দেখন-হাসি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক থাক, ঢের হয়েছে, পীরবাবাকে পেন্নাম করি, কিন্তু আসলে পাঁচুঠাকুরের মাদুলি আমিই চার বৎসর আগে এনে দিয়েছিলাম—পরে নি গো, পরে নি; শুধু হাত দিয়ে নেড়ে আমাকে ফেরত দিয়েছিল, ওইটুকু ছোঁয়াতেই এতদিন বাদে কাজ হ'ল, মাদুলিটা পরলে কি এতদিন ঘর খালি ক'রে ব'সে থাকতে হ'ত। উক্ত আলোচনা চলিতেছিল নলিন স্বর্ণকারের কোঠাঘরের দাওয়ায়। গত রাত্রে আঁতুড়ঘরে ইঁহারাই তো সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পুত্রের বর্ণ যেন দুধ ও আলতা দিয়া গোলা, পুষ্ট সবল শিশু, মায়ের কোল জোড়া করিয়া আঁতুড়ঘর আলো করিয়া তুলিয়াছে। পাড়ার পুরুতঠাকুর আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। যে দেখিতেছে সেই বলিতেছে, আহা, ছেলে তো নয়, একেবারে রাজপুত্তুর। ননীগোপালের মতই নরম।

নলিন এই শুভ খবরটি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর একদিনও সে আঁতুড়ঘরে যায় নাই। সকলে অবাক হইয়া গিয়াছে। তিন তিন বারের পর অমন ছেলে পেলে—কোথায় বামুন-ভোজন কাঙালী-ভোজান করাবে, তা না, কি-রকম মুষড়ে আছে! আরে বাপু, এ তো মেয়ে নয় যে, এখন থেকেই বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে। খরচ না করার কারণ দাঁড়াইল নলিনের কৃপণ স্বভাব। অনেকেই বলিল, বোঝ না, লোকটার খরচ বাড়ল, ওর কাছে টাকার দাম নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি।

(৩)

নলিন

চিকিৎসক রোগীকে দেখিয়া যক্ষ্মারোগের সম্ভাবনা আছে জানাইয়া দিলে রোগী যেমন তিলে তিলে রোগের আগমন আতঙ্ক লইয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ নলিনও আঁতুড়-ঘরের ঘটনার জন্য আশঙ্কায় সময় কাটাইত। যে বিপদকে দৈবকৃপায় এতদিন এড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখন বীভৎস প্রমাণ লইয়া তাহাকে এবং তাহার সংসারকে আক্রমণ করিয়াছে। এ আক্রমণের কবল হইতে নিস্তার নাই, প্রকৃতি তাহার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য খড়্গ ধরিয়াছে, বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি তো তাহার নাই। যৌবনকে জানিবার অবকাশ পর্য্যন্ত সে যে পায় নাই, কারণ যৌবন আসিবার বহু পূর্ব্বে তাহার স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিয়াছিল। এতকাল স্থবিরতাকে চাপা দিয়া আসিতেছিল, এখন রাসমণির সন্তানকে নিজের

নয় বলিবার উপায় নাই। পুরুষ শক্তিহীন, এ কথা সে স্বীকার করে কেমন করিয়া! নলিন মানিয়া লইল পুত্র তাহার।

আঁতুড়-ঘর হইতে বাহির হইবার দিন নলিন পাড়ার লোক সাক্ষী রাখিয়া একটি পুরা মোহর দিয়া রাসমণির ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ দেখিল। নলিনের প্রথম সন্তান, সোনা দিয়া মুখ না দেখিলে লোকে বলিবে কি! রাসমণির জন্য চওড়া লালপেড়ে পট্টবস্ত্রও কিনিয়া আনিয়াছিল। সকলেই খুশি হইল। রাসমণি স্বামীর দেওয়া কাপড়খানিও পরিল এবং শিশুকেও নিবিড়ভাবে বক্ষে টানিয়া ধরিল। শিশুর নধর ও সুদর্শন মূর্ত্তি নলিনের নিকট একতাল নোংরা পচা মাংসের মত মনে হইতেছিল। উহার পূতিগন্ধ অসহ্য, তথাপি সকলের সামনে শিশুর গণ্ডে চুম্বন করিল। নৃশংস পরীক্ষায় নলিন তখনকার মত উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু নবাগত জীবটি তাহার পক্ষে দৃষ্টিশূল হইয়া উঠিতেছিল। এই শূলের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কি কোন উপায় নাই? নলিন ভাবিল, নাই কেন, অনুসন্ধান করিলেই একটা কিছু পথ বাহির হইয়া পড়িবে।

শিশুকে দৃষ্টির আড়ালে সরাইয়া ফেলিবার জন্য ব্যবসায়ীর কূট মস্তিষ্কে যেসব চক্রান্ত ঘুরিতেছিল, তাহা প্রকাশ্যে বলিবার নয়। যেখান হইতে বিষের চলাচল শুরু হইয়াছে, সেই ক্ষতস্থানটি নলিন আবিষ্কার করিয়াছে।

মহেন্দ্র যে দিন হইতে নলিনের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই দিন হইতেই নলিন বুঝিয়াছে, তাহার গৃহে আগুন লাগিতে দেরি নাই। মহেন্দ্রের গতায়াতে বাধা দিবার ক্ষমতা নলিনের ছিল না, কারণ যে আকর্ষণ মহেন্দ্রকে টানিতেছিল, তাহা আগুন জ্বালাইবারই উপকরণ। নলিন অন্তর্জ্বালায় ছটফট করিতেছিল। প্রাণ খুলিয়া দুঃখকে উজাড় করিয়া ফেলিবে, সে উপায়ও নাই। নলিনের চিন্তাধারা একটি নির্দ্দিষ্ট পথ লইতেছিল। চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মহেন্দ্রের এখানে আসা বন্ধ হইতে পারে। পাড়ার লোক এখনও কানাঘুষা করিতে আরম্ভ করে নাই, কিন্তু করিতে কতক্ষণ! গ্রামের জমিদারকে আনিতে পারিলে, যে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস পাইবে না। প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিলে তাহাকে একঘরে করিয়া দিতে পারে এবং তৎসহিত ব্যবসাও যে ঢিলা পড়িয়া যাইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? টাকাই মানুষের বল। অর্থাভাব হইলে কেলেঙ্কারির বোঝা সে বহন করিবে কেমন করিয়া? পরের ঘটনায় নলিন গভীর চিন্তার পর তাহার সিদ্ধান্ত কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল জানা যাইবে।

গ্রামের জমিদার ছোটকর্ত্তা। নলিন একদিন বারবেলা কাটাইয়া

তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে ছিল একটি বাহক—দুইটি কাত্‌লা মাছ হাতে ঝুলাইয়া।

ছোটকর্ত্তা বৈঠকখানাতেই বসিয়াছিলেন। ঘরটি অপ্রশস্ত নয়। সস্তায় কেনা নকল কাট্‌গ্লাসের পাঁচ-ছয়টি দেওয়ালগিরি। মাঝখানে মখমলের টানা-পাখা, অসংখ্য তালি পড়িয়াছে; প্রথম দর্শনেই অনুমান করা চলে, পাখাটি ব্যবহার হয় না, একটু নড়িলেই মখমল খসিয়া পড়িবে। দুই-চারিটি স্প্রিঙের গদিযুক্ত প্রাচীন চেয়ার, ছেঁড়া কার্পেটের উপর হিসাব করিয়া চার কোণে চারটি বসানো হইয়াছে। চেয়ারে বসিবার উপায় নাই, কারণ স্প্রিংগুলা ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নরদেহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলেই যেন কামড়াইয়া দিবে। কার্পেট-চেয়ারের ব্যবস্থা যে দিকটায় ছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকে নীচু তক্তাপোশের উপর ফরাশ পাতা, ফরাশের চাদর এক মাসের আগে রজক-গৃহে যায় না, সেই কারণে তাহার দৃশ্য অস্বস্তিকর হইয়া আছে। কয়েকটি তাকিয়াও আছে, সেগুলি তুলনায় চাদরের চেহারাকেও খাটো করিয়া দিয়াছে। তক্তাপোশের নিকটে অনেকগুলি পিকদানি, প্রায় সবগুলি পরিপূর্ণ, গতকাল তাসের মজলিসে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখনও পরিষ্কার করা হয় নাই। নবাগত আগন্তুককে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ফরাশের দিকে অগ্রসর হইতে হয়, নিষ্ঠিবন-আধারগুলি ঠিকরাইয়া পড়িবার ভয়ে। ঘরের একটি কোণে চার-পাঁচটি বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত হুঁকা, একটি সাধারণ ফরসি, কলকে ও টিকার সরঞ্জাম, এনামেলের একটি রং-চটা প্লেটও আছে, ইহাতে কাঁচা তামাক রাখা হয়। সংক্ষেপে ঘরের আসবাব-পত্র দেখিলেই গৃহকর্ত্তার রুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

ছোটকর্ত্তা আসলে বড়কর্ত্তার ছোট ভাই। বড়কর্ত্তা বুড়োবাবুর প্রথম পক্ষের পুত্র, বাল্যকালেই কি এক সাংঘাতিক অসুখে মাত্র এক রাত্রি ভুগিয়া মারা যান। বড়কর্ত্তার বিধবা মাতাও বৎসর খানেকের ভিতর পুত্রশোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার পথানুসরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। বলুক, উপস্থিত আমাদের লোকমতের সহিত কোন যোগ নাই। বড়কর্ত্তার মৃত্যুর পর, বড়বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র সন্তান ছোটকর্ত্তাই, বংশের একমাত্র ওয়ারিস সাব্যস্ত হওয়ায়, সমস্ত সম্পত্তির মালিক তিনিই হইয়াছিলেন। ছোটকর্ত্তা দেখিতে মন্দ নয়, নধর গোলগাল চেহারা, জোরে হাঁটিলে গণ্ডদ্বয় শিশুর মতই দুলিতে থাকে। তাসের বৈঠকের লোকেরা বলে, বাবুর জমিদারের মত চেহারাই বটে। একে নধর চেহারা, তাহার উপর

কাঁচা বয়স ও গ্রাম্যোপযোগী আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকায় অনেক বিষয়ে তিনি আকর্ষণের কারণ হইয়াছিলেন। আকর্ষণের শক্তি যখন ছিল, তখন ধরিয়া লইতে হইবে, শক্তির ব্যবহারও হইত। কি ভাবে হইত, সকলে জানিবার সুবিধা পায় নাই।

নলিন মাছ দুইটি দরজার নিকট রাখিয়া জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং করজোড়ে বলিল, হুজুর, সামান্য নজর এনেছি। ছোটকর্ত্তার ভোজনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সুনাম ছিল, কাত্‌লা দুইটি তাঁহার লাগিল ভাল। ভজা পুরাতন ভৃত্য। তাহাকে ডাকিয়া মাছ দুইটিকে ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর নলিনকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন তোমাকে দেখি নি, বাড়ির সব খবর ভাল তো?

আজ্ঞে হুজুর, আপনার কৃপায় দিন চলে যাচ্ছে। হুজুরের কাছে এসেছিলাম এই বরফি চুড়িগুলো দেখাবার তরে, তা এর দামটা কি আপনার নামেই লিখে রাখব?

ছোটকর্ত্তা আকাশ হইতে পড়িলেন, সে কি! আমি রূপোর চুড়ি নিয়ে কি করব?

আজ্ঞে হুজুর, আমিও তো তাই ভাবছিলাম, তবে ও-পাড়ার গয়লানিছুঁড়ীটা—

ওপাড়ার গয়লানীর নাম করিতেই ছোটকর্ত্তা বুঝিলেন, ব্যাপারটা গোপন নাই। এখন স্বীকার না করিলে খবরটি চারধারে ছড়াইয়া পড়িবে। গ্রামময় রাষ্ট্র হইলে জিয়ানো জীবগুলির অভিভাবকরাও সাবধান হইয়া যাইতে পারে। তা ছাড়া এসব বিষয়ে এক-আধজন জানিলে তত বেশি অসুবিধার কারণ নাই। খবর ছড়াইয়া পড়িলে সব দিক দিয়াই ক্ষতি; জামতলার জমিদার-কন্যার সহিত বিবাহের কথা চলিতেছে, বিশ হাজার টাকার বন্দোবস্ত একেবারে ফাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। ছোটকর্ত্তা আপ্যায়িত করিয়া নলিনকে মাটিতে বসিতে বলিলেন।

নলিন নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করিল, কিন্তু বসিল না, জোড়হস্তে বলিল, হুজুর, আপনার সামনে—ও কি কথা বলছেন? তা হ'লে কি হুকুম হয় হুজুর?

ছোটকর্ত্তা চুড়িটা হাতে লইয়া বলিলেন, তুমি চমৎকার কারিকর তো।

হুজুর, বাপ-দাদার জাতধর্ম্ম আর আপনাদের নেক্‌নজর নিয়ে যেটুকু ক্ষমতা আছে, তাই নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, গয়লানীটা সেদিন পায়ে এসে পড়ল, ওর কি রকম বোনের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কয়েকটা গয়না না হ'লে মেয়েটার বিয়ে হয় না।

কি আর করি, বললাম, নলিন স্যাকরাকে আমার নাম ক'রে বলিস, যা দাম হয় দিয়ে দোব। গরীব লোক, কি আর করি বল ?

তা তো ঠিক কথাই হুজুর। আপনি কত বড় বংশের ছেলে, গরীবের মা-বাপ, আপনি না দিলে আর কে দেবে ? স্তুতিবাক্যগুলি যেন নলিন আসিবার পথে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিল। ছোটকর্ত্তার দানশীলতার কথা গ্রামের সকলেই জানে। আট আনার খাজনা তিনি কখনও মাপ করেন নাই। হাটের তোলার শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলি বাড়িতে পৌছাইয়া না দিলে জরিমানা দিয়া ব্যাপারীকে পুনরায় হাটে বসিতে হয়। ক্রিয়াকর্ম্মে বাবুর ব্যাগারী ভৃত্যগুলিকে নিমন্ত্রণ করিয়া চব্যচোষ্য না দিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, এ-হেন ছোটকর্ত্তা দূরসম্পর্কীয় ভগ্নীর বিবাহের জন্য গোয়ালিনীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন কেন, নলিন বহুপূর্ব্বেই জানিত।

নলিন হাতজোড় করিয়া বলিল, হুজুর, আমার একটা সাধ আছে, ভরসা দেন তো পেশ করি।

আরে, অমন করছ কেন ? তোমরা তিন পুরুষের প্রজা, তোমাদের কথা রাখতে পারলে, 'না' বলতে পারি ?

হুজুর, এক-আধবার আমার গরীবখানায় যদি পদধূলি দেন তো কিতাথ্য হয়ে যাব।

এই কথা ! এর জন্যে এত ভয় পাচ্ছিলে ! নিশ্চয় যাব, তা কবে যেতে হবে ?

হুকুর, আমার ছেলের অন্নপ্রাশন শিগগির, আমি আবার এসে খবর দিয়ে যাব। তা হুজুর, আমার ওখানে কিছু খেয়ে আসবেন। আমার ছোটবউ রাঁধে ভাল, আপনাকে খাওয়াতে পারলে বউটাও ধন্য হয়ে যাবে।

বহুবার বধুর কথা বলিতে ছোটকর্ত্তা নিজের অজ্ঞাতেই একবার গোঁফটায় চাড়া দিয়া লইলেন, হয়তো তাহার গোপন অর্থ কিছু ছিল।

তা তোমার বউয়ের হাতের রান্না খাব, সে তো ভাল কথা। তা তোমার বউয়ের বয়েস কত ? আমাকেও তো কিছু দিতে-থুতে হয়। বয়েস-হিসেবে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে চাই, তুমি কি বল ?

আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের খেয়েই মানুষ, তা যা মর্জ্জি হয় করবেন। বয়েস আর কি বলব, হুজুর, তৃতীয় পক্ষের কিনা, বুঝতেই পারছেন, আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কি আর অত বয়সের হিসেব রাখতে পারি ? তবে—

ছোটকর্ত্তা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি বউয়ের হাতের রান্না খাইতে যাইবেন।

নলিন কাজ গুছাইয়া ফিরিয়া আসিল। রাসমণিকে বলিল, আমাদের ভাগ্যি ভাল, ছোটকর্ত্তা খোকার ভাতে আমাদের বাড়ি আসছেন। আমি বলেছি, তুমি রাঁধবে। ছোটগিন্নী, রান্নাটার যেন তারিফ পাই। রাসমণি স্বামীর সহিত কখনও রসিকতা করিবার সুযোগ পায় নাই, মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল, স্বামীর আদেশ পালিত হইবে। রান্না করিবে রাসমণি, প্রশংসা প্রাপ্য রাসমণির। নলিন নিজেকে পাচকের স্বত্বাধিকারী ভাবিয়া গৌরবান্বিত হইতে চায়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে রাসমণি নলিনের সহিত সম্বন্ধটা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোর করিয়া ফেলিয়াছিল। এতকাল যে অহমিকা লইয়া স্বামীর সামনে বুক ফুলাইয়া চলিত, এখন তাহা চূরমার হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন কতক লজ্জা আসিয়াছিল, লজ্জা এখন নির্দ্দয় প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে। নলিনই সব দুর্ঘটনার উপলক্ষ্য, রাসমণি নলিনকেই সব রকম অঘটনের কারণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু এখন তাহার অন্তরে নাই। সামান্য কারণেই খিটিমিটি আরম্ভ করিয়াছে, নলিনও বাড়ি ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারিলে বাঁচে।

নলিন জানাইতে চাহিয়াছিল, সে কেউকেটা মানুষ নয়, গ্রামের জমিদারকে পর্য্যন্ত সে বাড়িতে আনিতে পারে। নিজের দুর্ব্বলতার পীড়নে সব সময় নলিন জর্জ্জরিত হইয়া থাকিত। জমিদারকে বাড়ি আনার মত আরও অনেক ঘটনা রাসমণির সামনে খাড়া করিয়াছে, শুধু নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য—এই ভাবিয়া, হউক সে দুর্ব্বল, তথাপি গ্রামের মধ্যে সে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাসমণি যেন তাহাকে তুচ্ছ করিয়া না দেখে। যোগাড় করা অনেক ঘটনাই রাসমণি দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে। প্রতিবাদ, রসিকতা অথবা কোন চাঞ্চল্য তাহার মুখে প্রকাশ পায় নাই। রাসমণি নির্লিপ্ত থাকিয়া নলিনকে আঘাত করিয়াছে। পুনরায় নলিন নূতন ঘটনা খুঁজিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে।

জমিদার আসিতেছেন জানিয়াও রাসমণি কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখাইল না। নলিন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, মহেন্দ্র সায়েবকেও ডেকেছি। মহেন্দ্রকে শুধু 'মহেন্দ্র' বলিয়া সম্বোধন করায় গ্রামের একজন প্রাচীন ব্যক্তিকে আদালতে মানহানির জন্য জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তাহার পর হইতে লোকে শিক্ষানুযায়ী কেহ প্রিন্স মহেন্দ্র অথবা মহেন্দ্র সাহেব বলিত। মহেন্দ্রের নাম শুনিয়াও রাসমণি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, শুধু বলিল, কি কি, আর ক'জনের জন্যে রাঁধতে হবে সময়মত জানিও, ব্যবস্থা করব।

রাসমণি অন্য কাজে চলিয়া গেল।

নলিন ভাবিতে বসিয়া গেল—তা হউক, তবু মহেন্দ্রের চেয়ে ভাল, না হয় ছোটকর্ত্তার সন্তানকেই সে মানুষ করিবে। তিন পুরুষ ধরিয়া ওদের নুন খাইয়া ও জমিতে বাস করিয়া আসিতেছে। উক্ত চিন্তাতেও যথেষ্ট অন্তর্জ্বালা ছিল, কিন্তু মহেন্দ্র-ঘটিত চিন্তায় বৃশ্চিকের হুল ফুটানোর মত নয়। মনকে সান্ত্বনা দিবার অবকাশ পাইয়াছিল এই ভাবিয়া—সে পূর্ব্বপুরুষদের ঋণ শোধ করিতেছে।

নলিনের বাড়িতে অন্নপ্রাশনের ধুম লাগিয়াছে। পাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ছোট মেয়ের দল নানা রঙের কাপড় পরিয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনই সময় ছোট কর্ত্তা পালকি করিয়া নলিনের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে যেখানে ছিল, ভিড় করিয়া ছুটিয়া আসিল জমিদারবাবুকে দেখিবার জন্য। চেহারা অন্যান্য সকলের মত রৌদ্রে পোড়া নয়, দেহবর্ণে জলুসের স্বাতন্ত্র্য আছে। বেশের মধ্যে শৌখিনতা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সদালাপের প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত সংযত। প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন মৃদু হাসিয়া। হাসিটিও কড়া শাসনের নিক্তির ওজনে প্রকাশ হইতেছে—এতটুকু বেশি নয়, এতটুকু কম নয়! সহজ জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত গ্রামবাসীরা ছোটকর্ত্তার আচরণে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। খাশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পাশে বসিয়া যে মানুষ কথা বলে, তাহার আচরণ আলাদা তো হইবেই।

ছোটকর্ত্তার অভ্যর্থনার জন্য সব কিছুর বৈশিষ্ট্য ছিল। নলিন ছোটকর্ত্তার অনুমতি লইয়া ভিতর-বাড়িতে চলিয়া গেল খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ছোটকর্ত্তা গোঁফে একটি চাড়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছোটবউ নিশ্চয় সামনে বাহির হইয়া পরিবেশন করিবে। বয়সটার কথা মনে পড়িতেই আর একবার গোঁফে চাড়া দিয়া বঙ্কিম দৃষ্টিতে ডগাটা দেখিয়া লইলেন। নলিন সেই যে ভিতরে ঢুকিয়াছে আর ফিরিবার নামটি নাই। ছোটকর্ত্তার ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার হইতেছিল। পুরুষের ভিড়ও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, পাশেই আসা-সোঁটা লইয়া দণ্ডায়মান হুকুমবরদারকে ডাকিলেন। হুকুমবরদার আসলে বাগ্‌দীপাড়ার সেই নেলাক্ষ্যাপা ছোঁড়াটা। আজ কয়দিন ধরিয়া ছোটকর্ত্তা নিজে তাহাকে রঙ্গমঞ্চে রিহার্সাল দিবার অনুকরণে আদব-কায়দা শিখাইয়াছিলেন। ছোঁড়াটাকে কুর্নিশ করা শিখাইতে গিয়া কতবার তাহাকে সেলাম: করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এত কাণ্ডর পর বেটা কিনা বগল চুলকাইয়া দুইটি হাত মাথার উপর রাখিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন একটি সং! সং সাজাইবার দায়িত্ব ছোটকর্ত্তা নিজেই লইয়াছিলেন। যে আচ্‌কানটি বেচারা পরিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা ঝাড়া ছয় ফীট দীর্ঘ, কোন সাজোয়ান পুরুষের ব্যবহারের জন্য ছোটকর্ত্তার পিতা

প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বুড়োবাবুর অমল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনবোধে অনেক ঠিকা হুকুমবরদার ওই পোশাকটি পরিয়া আসিতেছে, প্রশ্ন কখনও উঠে নাই—মাত্র পাঁচ ফীট দুই ইঞ্চি খাড়াই একটি ছোকরা অতি লম্বা মানুষের পোশাক পরিলে আর কত সুন্দর দেখাইতে পারে! একে তো ওই পোশাক, তাহার উপর দুইটি হাতই জোড়া, এক হাতে আসা আর এক হাতে সোঁটা, ইহার উপর স্থানচ্যুত জরির সুতাগুলি নাকে সুড়সুড়ি দিবার সুবিধা খুঁজিয়া লইয়াছে, বেচারা বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাবুর নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই নাসারন্ধ্রের ভিতর একটি কর্‌করে সুতা নির্ব্বিঘ্নে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল; সে হাঁচি আটকাইতে পারিল না। যেমন হাঁচা, অমনই ধাতু নির্ম্মিত সোঁটাটি একজনের উলঙ্গ টাকের উপর আসিয়া পড়িল; শব্দটা হইল ধাতু ও কাঠে ঠোকাঠুকির মত। আঘাতপ্রাপ্ত মানুষটি মাথায় হাত দিয়া সেখান হইতে নীরবে উঠিয়া গেল। জমিদারের হুকুমবরদার, তাহার বিরুদ্ধে এর বেশি আর কি করা চলিতে পারে! ঘটনাটির পর ছোকরা আসা-সোঁটা দুইটিই মাটিতে রাখিয়া কোনও প্রকারে আচ্‌কান সামলাইতে সামলাইতে বাবুর সামনে আসিয়া দাড়াইল। পরিবার সময় বহু-পুরাতন আচ্‌কানটা দেখিয়া পরে নাই। ভিতরে একটা আরসোলা আস্তিনের গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া পরমানন্দে কর্দ্দমাক্ত ঘাম ভক্ষণে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আরসোলার কামড় খাইয়া হুকুমবরদার কুনিশ ভুলিয়া যদি বগল চুলকাইয়াই থাকে, তাহাতে আর দোষের কি থাকিতে পারে! ছোটকর্ত্তা তাহার ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া হুকুম করিলেন, দেখে আয়, আর কত দেরি। কাহাকে অথবা কি দেখিতে হইবে তাহার উল্লেখ ছিল না, বেচারা ফাঁপরে পড়িয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, তা বাবু, কি দেখতি বল্‌তেছেন? ছোটকর্ত্তা তাহাকে অতি নিকটে ডাকিয়া প্রায় কানের কাছে গিয়া বলিলেন, হারামজাদা, তোর মাথা আর মুণ্ডু, আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যা।

—যে আজ্ঞে। বলিয়া ছোকরা পোশাক পরিয়াই বাগ্‌দীপাড়ার দিকে রওয়ানা হইল। আসা-সোঁটা নলিনের বাড়িতেই পড়িয়া রহিল।

নলিন ভিতরের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। ছোটকর্ত্তাকে গাত্রোত্থান করিবার কথা বলিতে ছোটকর্ত্তা বলিয়া বসিলেন, আমার সঙ্গে অনেক লোক খাবে নাকি হে? আমি তো সকলের সামনে খেতে পারি না। একটু নিরিবিল হ'লেই ভাল হয়।

নলিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, সে কি হুজুর, আপনাকে আমি সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে খেতে বলতে পারি? আপনি হলেন আমাদের রাজা লোক

ছোটকর্ত্তা হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। গোঁফটায় চাড়া দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া

জমিদার

উঠিয়াছিল, নিজেকে সংযত করিয়া কেবল আড়চোখে ডগা দুইটা দেখিয়া লইলেন। নলিন পথ দেখাইয়া ছোটকর্ত্তাকে ভিতর-বাড়িতে লইয়া গেল।

রাসমণি জমিদার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছে, কিন্তু দেখিবার সুবিধা সে কখনও পায় নাই। যেসব বর্ণনা শুনিয়াছিল, তাহাতে গুণাধারকে দেখিবার জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার কোন কারণ ঘটে নাই। রাসমণি বৃহৎ ঘোমটা টানিয়া ছোটকর্ত্তার পদধূলি লইল। কাপড়ে সমস্ত দেহ আবৃত থাকিলেও চরণস্পর্শকালে দক্ষিণ বাহুর পূর্ণ গঠন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোটকর্ত্তা রসগ্রাহী ব্যক্তি। বাহুর গঠন-মাধুর্য্য দেখিয়া মুখটি দেখিবার জন্য আনচান করিতে লাগিলেন। নলিনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার বিয়েতে তো আসতে পারি নি। অনেকদিন বিয়ে করলে কি হবে, আমার কাছে এখন তো তোমার ছোটবউ নতুন বউ, কি বল বাছা? তা আমাকে তোমার বউয়ের মুখ দেখাবে না? অদ্ভুত রসিকতা করিয়াছেন ভাবিয়া নিজের উক্তিতে হাসিয়া লুটাপুটি খাইলেন। জমিদার হাসিতেছে, নলিন বেচারা তাঁহার সহিত যোগ না দিয়া করে কি—নিজে তো যোগ দিলেই, রাসমণি-কেও হাসিতে ইশারা করিয়া দিল। রাসমণি হাসিল না, ঘোমটাও খুলিল না।

রাসমণির আচরণ নলিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া নলিন নিজেই রাসমণির ঘোমটা খুলিয়া দিল, তাহার পর বলিল, হুজুর, আপনার মত রাজালোকের সামনে ও তো কখনও দাঁড়ায় নি, তাই লজ্জা পাচ্ছিল।

রাসমণির চক্ষু দুইটি তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তথাপি ডাগর পাপড়ির গাঢ় রেখায় নয়ন-যুগলের পূর্ণ রূপ ছোটকর্ত্তা কল্পনায় দেখিতে পাইলেন। রং কালো, কিন্তু মুখশ্রী রাজার ঘরে শোভা পায়। ছোটকর্ত্তা প্রথম দর্শনেই মজিলেন।

নলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বউ-ভাগ্যি ভাল। কই, তোমার ছেলেকে আনতে বললে না?

নলিন ইশারা করিল, রাসমণি পুত্রকে আনিতে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

রাসমণি পুত্রকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেই, ছোটকর্ত্তা নলিনকে অনুরোধ করিলেন পাল্কী হইতে নূতন গরদের শাড়িটি লইয়া আসিতে। নলিন শাড়ি আনিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাসমণি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মাথা নত করিয়া ছোটকর্ত্তার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল। ছোটকর্ত্তা নিকটে আসিয়া শিশুকে নানাভাবে আদর করিতে লাগিলেন। সবল দামাল শিশু মাতার ক্রোড়ে হাসিয়া খেলিয়া রাসমণিকে প্রায় নাকাল করিয়া ছাড়িতেছিল। ছোটকর্ত্তা বলিলেন, অমন জোয়ান ছেলেকে সামলানো তোমার কর্ম্ম নয়, আমাকে দাও।—

বলিয়া হাত বাড়াইয়া দুষ্টকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মাতার ক্রোড় হইতে ছোট-কর্ত্তার নিকট শিশুর আসিবার সময় যে ঘটনাটি ঘটিল, তাহাতে ছোটকর্ত্তা মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন।

নলিন শাড়ি লইয়া ফিরিয়া আসিতেই ছোটকর্ত্তা শিশুপুত্রকে নলিনের নিকট দিয়া তাহার নিকট হইতে শাড়িটি লইয়া রাসমণিকে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন। সময়টা বাড়াইয়া লইবার জন্য ছোটকর্ত্তা শাড়ি কি ভাবে কিনিয়াছিলেন, কোথায় কিনিয়াছিলেন, কত দাম দিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। চোখের সামনে নলিন এই দৃশ্যটি দেখিতে চায় নাই।

ঘটনাটি ঘুরাইবার জন্য নলিন বলিল, কাপড়টা এখন আমাকে দিন, আপনার খাবার জুড়িয়ে গেল।

আহার-সমাপ্তির পর ছোটকর্ত্তা বাহিরে আসিয়া নলিনকে একলা পাইলেন। অন্য নিমন্ত্রিতদের তখন পংক্তিতে ডাক পড়িয়াছে।

—তোমার বউ চমৎকার রাঁধে! তা দেখ, তোমার ছেলের মুখ দেখার জন্যেও সোনার কিছু দিতে হয়, ভুলো মন, সঙ্গে আনতে পারি নি। তা গয়লানীর বরফি চুড়ির দামের সঙ্গে তোমার ছেলের জন্যে একটা সোনার বালার দামও জুড়ে দিও, এর জন্যে তোমার বানি তেমন বেশি কিছু তো পড়বে না, হাজার হোক তোমার নিজের ছেলে, কি বল ?

নলিন করজোড়ে বলিল, যে আজ্ঞে হুজুর।

উত্তর শুনিয়া ছোটকর্ত্তা বলিলেন, তুমি বড় ভাল লোক হে নলিন, তোমার মত খাঁটি লোক আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। তা দেখ, আমি দুপুরবেলা প্রায় পাখি শিকারে বের হই, তা তোমার এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার সুবিধে হতে পারে ? জানই তো আমি শিকারে কাউকে সঙ্গে নিই না। কেবল ক'টা পালকির বেয়ারা থাকে, তা ওরা গাছতলায় ব'সে থাকবে, কি বল, অ্যাঁ ?

নলিনের চেষ্টা বৃথা যায় নাই, এক কথাতেই নলিন রাজি হইয়া গেল। বলিল, হুজুর, আমি তো দুপুরবেলা এখানে থাকব না, তা রাসমণিকে ব'লে যাব, সে আপনার আরামের জন্যে সব করবে।

—আহা, মেয়েমানুষকে কষ্ট দিয়ে আর কি হবে ?

—সে কি হুজুর! আপনার সেবা আমার বউ করলেও আমার পুণ্যি হবে, আপনি হলেন আমাদের মা-বাপ, রাজালোক। সে কি কথা হুজুর, আমি রাসমণিকে এ বিষয়ে সব ব'লে রাখব

রাত্রি-ভোজন শেষ করিয়া ছোটকর্ত্তা বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

(৪)

বাজুবন্ধ

নলিনের সময় ফিরিয়াছে, দোকান ও তেজারতির কারবার ফাঁপিয়া উঠিয়াছে—একটীর স্থানে দুইটী পাশাপাশি কোঠাঘর হইয়া গেল। ঘর দুইটী বাহির বাড়ী সংযুক্ত। একটী ঘর সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করিবার জন্য। নলিনের ব্যবসা ও সময়ের দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়াই যেন রাসমণির জীবন ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। সে পথ হারাইয়াছে। নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন যে দিন হইতে সে জলাঞ্জলি দিয়াছে সেইদিন হইতেই সে নিজেকে সর্ব্বহারা ভাবিতেছে। যে সঙ্কোচ ও লজ্জা এতদিন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল মহেন্দ্র তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। স্বামী জানিতে পারিয়াও কিছু বলে নাই অধিকন্তু স্নেহের বিনিময়ে তাহাকে আরও বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—দুধের ক্ষুধাকে ঘোল দ্বারা নিবৃত্ত করিবার মত। স্নেহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে নাই কিন্তু অন্তরে নলিনের আদরকে একেবারে ফাঁকা ভাবিয়াছে। রাসমণি ভাবিতে থাকে কেন এমনটি ঘটিল, কেমন করিয়া সে মহেন্দ্রকে নারীর সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল? মহেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতার পর আত্মশ্লাঘা প্রতিনিয়ত তাহাকে পীড়ন করিয়াছে কিন্তু ফিরিবার পথ সে খুঁজিয়া পায় নাই। অখাদ্য ভক্ষণের জন্য সে কি একলাই দায়ী। স্বামী তাহাকে চিরটীকাল অনশনে রাখিয়াছিল। বুভুক্ষু যৌবন আহারের অভাব সহ্য করিতে পারে নাই। সাম্‌নে যাহা পাইয়াছিল তাহাই সুখাদ্য ভাবিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল। রাসমণি ভাবিতে পারে নাই একদিনের অনশনভঙ্গ তাহার ক্ষুধাকে আরো বাড়াইয়া তুলিবে। চরিত্র-স্খলনের কারণ নানা দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। অবশেষে তাহার ভাগ্যের জন্য বিধাতাকে অভিশাপ দিয়াছে।

মহেন্দ্রের পর ছোটকর্ত্তা আসিলেন। ছোটকর্ত্তাকে তো তাহার প্রয়োজন ছিল না। ছোটকর্ত্তা নিতান্তই সাধারণ জীব। তাঁহার যৌবন একটি মিথ্যার খোলস মাত্র, তাহাও জীর্ণোন্মুখ হইয়া আছে। কাচা বয়সের পাড়ে ভাঙ্গন লাগিয়াছে, যে কোন সময় পাড় ধ্বসিয়া পড়িবে। তখন বয়সের নামটা টিকিয়া যাইতে পারে কিন্তু দাঁড়াইবার স্থান আর ছোটকর্ত্তার থাকিবে না। রাসমণি মনে মনে হাসিল, এই জাতীয় জীবকেই সাধারণে যুবক বলিয়া থাকে। রাসমণি

নিজেকে প্রশ্ন করিতে থাকে—সত্যই কি সে মহাপাতকী হইয়াছে। স্থূল দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি যদি এতই তুচ্ছ ত বাস্তব প্রেরিত অতৃপ্ত বাসনা এত প্রবল হয় কেমন করিয়া। রাসমণি ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না, সংসারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ফেলে।

ছোটকর্ত্তার নলিনের বাড়ীতে গতায়াত এখন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে—শিকারের পর বিশ্রামের জন্য নলিনের এখানেই উঠিতে হয়। ভিতর বাড়ীতেই তিনি বিশ্রাম করেন রাসমণির সেবা পাইবার জন্য।

সেদিন ছোটকর্ত্তা রাসমণির জন্য সোনার বাজুবন্ধের ফরমাস দিয়াছিলেন। বাজুবন্ধের কারুকার্য্যনিপুণতা নলিনের মনে লাগিয়াছে। রাসমণি পরিবে, সে প্রাণ ভরিয়া অলঙ্কারটাকে রূপ দিয়াছে। বাস্তবিকই নলিন গ্রামের ভিতর ওস্তাদ কারিগর। নিজের হাতে গড়া গহনাটী একবার রাসমণিকে দেখাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পসৃষ্টির দক্ষতা দেখিয়া রাসমণি তারিফ করিলে তাহার খাটুনি সার্থক হইবে। কিন্তু গহনাটী ত তাহার নিজের দান নয়—সে মাত্র প্রসাধন উপকরণের উপলক্ষ। গহনা যিনি ফরমাস দিয়াছেন তিনি খাশ জমিদার—গহনার গ্রহীতা যিনি তিনি নলিনের বিবাহিত পত্নী। দাতার পছন্দের ছাপ অলঙ্কারের নক্সার গায়ে গায়ে লাগিয়া গিয়াছে—এখন ত রাসমণিকে দেখাইবার উপায় নাই। কথা আছে ছোটকর্ত্তা স্বহস্তে গহনাটী রাসমণিকে পরাইয়া দিবেন, সে যেন বাজুবন্ধ ইহার আগে না দেখে। নলিন প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহা খেলাপ করে কেমন করিয়া। রাসমণিকে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বিবাহিত পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—তাহার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভার নলিনের উপর, তথাপি সে নিজের পত্নীকে গহনাটা পরাইয়া দেখিতে পারিবে না? হউক ছোটকর্ত্তা গ্রামের জমিদার তাহাতে কি যায় আসে—না হয় আর একটা নূতন বাজুবন্ধ নলিন তৈয়ারী করিয়া দিবে—নলিনের ভীরু মন নিজের সিদ্ধান্তই নিজে সমর্থন করিতে পারিল না—পরক্ষণেই ভাবিল, তা কি হয়, হাজার হোক জমিদার ত বটে—ইচ্ছা করিলে কাল তাড়াইয়া দিতে পারে। জমির দখলে ত মৌরুসী পাট্টা নাই। নলিন জমিদার ও আইনের ক্ষমতা ভাবিয়া দমিয়া যাইতেছিল।

নলিন বাজুবন্ধ সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিতেছিল এমন সময় দেখিল রাসমণি স্নান করিয়া পুরাতন রোয়াকটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখুনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবে—নিতম্ব অতিক্রম করিয়া সিক্ত কেশরাশি পিছনটা প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, চুলের ঘন গোছার রেখা লীলায়িত—তাহারই অতি নিকটে দুইটী

বাহু যাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নলিন খুঁজিয়া পায় না। নলিন আর নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। বাহু দুইটীর স্পর্শানুভূতির কাঙাল হইয়া উঠিল। নিকটে যাইবার অধিকার সে নিজেই হারাইয়াছে। বাজুবন্ধ—একটী প্রাণহীন ধাতু নির্ম্মিত গহনা, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সে অগ্রসর হইয়া গেল—তখন রাসমণি গামছার সাহায্যে দীর্ঘ কেশরাশি হইতে জল নিষ্কাশণ করিতেছিল—এক একটা ঝাঁকুনিতে উন্নত স্তনদ্বয় দুলিয়া উঠিতেছিল, নলিন মুগ্ধ হইয়া গঠনের মাধুর্য্য দেখিতে লাগিল।

রাসমণি চুলকে বিড়ার মত করিয়া বাঁধিতেই. নলিন অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পর সোনার বাজুবন্ধ তাহার সামনে খুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পছন্দ হয় ? আমি নিজে তৈরী করেছি।

রাসমণি বাজুবন্ধটী একবার মাত্র দেখিল। মিহি রেখায় সূক্ষ্ম তারের কাজ পরীক্ষা না করিয়াই বলিল—খুব ভাল হয়েছে। ইতিমধ্যে নলিনের নিকট গহনা পরানোর বিষয় গৌণ হইয়া আসিয়াছে। নলিন নিটোল গোল হাতটী স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আরো নিকটে আসিয়া বলিল—তোমার হাতে এটা পরিয়ে দেখি-না কেমন লাগে।

রাসমণি আপত্তি করিল না, হাত বাড়াইয়া দিল। নলিন বাহুটী নানা ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—বলিতেও চাহিয়াছিল, কি সুন্দর গড়ন তোমার ; কিন্তু রাসমণি কি তাহার উচ্ছ্বাসকে সম্মান দিবে ! কতবারই ত সে অকপট প্রশংসায় রাসমণিকে ভূষিত করিয়া দিয়াছে। রাসমণি ত তাহা ভূষণ বলিয়া মানে নাই। তাহার উচ্ছ্বাসকে নগণ্য ভাবিয়াছে। কত সময় তাহাকে রূঢ় ভাবে বলিয়াছে—থাক্ আর রসিকতায় কাজ নাই, বুড়া বয়সের সোহাগ আর সয় না। তবু নলিনের মনের ক্ষুধা আছে, সে দক্ষিণ হস্তটী আবার ধরিল—মাংসের মোহ অনেক অপমানই ভুলাইয়া দেয়। বহুদিন পর রাসমণির হাতটী নলিন ছুঁইতে পাইয়াছে। সে থাকিতে পারিল না, নিবিড় ভাবে বক্ষের মাঝে হাতটা চাপিয়া ধরিল—রাসমণির নিকট হইতে কোন প্রতিবাদ আসে নাই কিন্তু অসম্ভব কৌশলে সে বাহুটীকে অসাড় করিয়া নলিনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। নলিন বুঝিল ইহার অধিক তাহার পাওনা নাই। নলিন নিজেকে রোগীর কোঠায় ফেলিয়া দিল এবং ভাবিতে লাগিল চিকিৎসকের আদেশ এবং পথ্যের ব্যবস্থার কথা। খাদ্যের নির্দ্দিষ্ট ওজনের বাহিরে যাইবার তাহার অধিকার নাই। চিকিৎসকের বিচার অমান্য করিলে পথ্য বিষ হইয়া যাইতে পারে। চিকিৎসক অর্থাৎ ছোটকর্ত্তা রোগীকে যথেচ্ছাচারী ভাবিয়া চিকিৎসাও বন্ধ

করিয়া দিতে পারেন। নলিন সব কিছুর সম্ভাবনায় ভীত হইয়া রাসমণির হাতটী ছাড়িয়া দিল কিন্তু তাহার দেহনির্গত বেসম ও চন্দনের গন্ধে বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, রাসমণিকে ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারিল না।

প্রত্যাখ্যানের জন্য নলিন ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিয়াছে ইহার জন্য দুঃখ কেন আসে। বাজুবন্ধটি নলিন না পরাইয়া ছোটকর্ত্তাই যদি পরাইয়া দেন তাহাতে দোষের কি থাকিতে পারে। ছোটকর্ত্তাকে ত নলিনই এখানে আনিয়াছে এবং তাহার টাকাতেই নূতন কোঠাঘর উঠিয়াছে। যে টাকা দিবে তাহার কোন দাবি থাকিবে না? নলিন যুক্তিকে টানিয়া আনিয়াছিল সান্ত্বনার জন্য কিন্তু পাইল না। সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না যে তাহার দাবি সকলের উপরে। দাবি থাকা সত্ত্বেও সে ভিখারীর মত আসিয়াছিল শুধু হাতটী প্রাণ ভরিয়া স্পর্শ করিয়া লইতে। রাসমণি এইটুকু সামান্য দামও দিতে পারিল না!

রাসমণিকে ছাড়িয়া নলিন বাজুবন্ধটী আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল রাসমণির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। রাসমণি দেখিয়াও যেন দেখিল না। নলিন সব দিক দিয়াই ভিখারী হইয়া গিয়াছে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাজুবন্ধটা তোমার পছন্দ হয়েছে? রাসমণি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে—নলিন কাষ্ঠহাসি-সহ উত্তর করিল—আমিও তাই ভাবছিলাম তোমার ভাল লাগবে—আচ্ছা তা'হলে এখন আসি। ছোটকর্ত্তার বাড়ী আবার যেতে হবে কিনা, একটু তাড়া রয়েছে।

তাড়ার কৈফিয়ত কেহ চাহে নাই তথাপি নলিন রাসমণিকে জানাইতে চাহিয়াছিল, সে যেন কিছু মনে না করে। নলিন বাজুবন্ধটী আবার পাতলা লাল কাগজে মুড়িয়া ফেলিল।

দুঃখের একপ্রকার রূপ আছে যাহার বাহ্যিক প্রকাশ অদৃশ্য কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই জাতীয় দুঃখ হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া যে প্রবাহ সৃষ্টি করে তাহা অন্তঃসলিলার মত। স্রোত বাধা পাইলে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করে বিস্ফোরণের জন্য। পথ দুর্গম হইলে নরম মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যায়। রাসমণির ক্রূর শৈথিল্যে নলিন যে ব্যথা পাইল তাহার বিস্ফোরণ হইবার কিছু নাই। নলিনের দুঃখ অধোমুখা ও অন্তর্ভেদী—হৃদয়ের গভীরতম গহ্বরে দুঃখ সলিল জমা হইয়া উঠিতেছে। কারণ সে রাগিতে জানে না। আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নলিনের বহিঃ-প্রকাশ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সহানুভূতির সম্ভাবনা না থাকিলে দুঃখ প্রকাশের

কোন অর্থ হয়? যে মর্ম্মপীড়ায় সে দিবারাত্র কষ্ট পাইতেছে তাহা ত' বাহিরের মানুষকে শুনাইবার নয়—একমাত্র রাসমণিই তাহার দরদী হইতে পারে —কিন্তু রাসমণি নিজেই ত সব দুঃখের কারণ, তাহার দরদী হইবার অবসর কোথায়? নলিনের একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, রাসমণিকে আর কিছু বলিতে পারিল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীর্ঘকাল ধরিয়াই রাসমণি স্বামীর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে —দীর্ঘনিঃশ্বাসের ব্যাকুল ধ্বনিও সে বহুবার শুনিয়াছে। সুতরাং বাজুবন্ধ জড়িত ঘটনায় রাসমণির মনে খট্‌কা লাগিল, ভবিতব্যের এ কি সাংঘাতিক অত্যাচার—প্রতারণার এই কুৎসিত অভিনয় কেন? সে ত কখনও চায় নাই স্বামীকে দুঃখ দিতে, জঘন্য জীবন যাপনে স্বামীগৃহ কলুষিত করিয়া দিবার প্রয়াসও কখন তাহার আসে নাই। অনশন তাহার অসহনীয় হইয়া আসিয়াছিল, কাহারও নিকট ত ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দয়া ভিক্ষা করিতে যায় নাই—মহেন্দ্র উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছে, ঐ পিশাচ মহেন্দ্রই তাহার দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া কুপথের জঞ্জালে ফেলিয়া দিয়াছে। ছোটকর্ত্তা কি তাহাকে নোংরা ভোগের বস্তু করিতে পারিত—যদি ঐ পিশাচ ভ্রষ্টতার পথ না দেখাইয়া দিত? বিপথে যদি ফেলিল, তবে তাহাকে উপযুক্তভাবে গ্রহণ করিল না কেন? রাসমণি মহেন্দ্রের দাসী হইয়া সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিল। মহেন্দ্র অত বড় ত্যাগের সম্মান দিল কই? সে এক নারীর ভালবাসাকে বিশ্বাস করে না, সে চায় বহুকে নিজের অধীনে রাখিতে। নিজের শক্তির গৌরব প্রচার তাহার ধর্ম্ম;—নারীর দেহ ও মন তাহার নিকট খেলিবার জিনিষ। রাসমণি ভাবিতে ভাবিতে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে—বিধাতাকে হৃদয় ছিঁড়িয়া অভিশাপ দেয়। স্থবির স্বামীই যদি তাহার ভাগ্যে ছিল তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য জীড়ন হইয়া আসিল কেন? ভগবান তাহাকে ছোটকর্ত্তার মত সাধারণ ও দুর্ব্বল করিলেই পারিতেন—সবল দেহের খোরাকের জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার আসিত না। স্বামী যে সত্যই তাহাকে ভালবাসে,—এ ভালবাসার প্রতিদান সে কি দিয়াছে? কেন তাহার পদস্খলন হইল? এ 'কেন'র সদুত্তর দিবে কে? যুগে যুগে ধর্ম্ম ও রাজনীতিকে মধ্যস্থ করিয়া এই প্রশ্ন মানুষ তুলিয়াছে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে নরকের কাল্পনিক বীভৎস শাসনের ছবি পথভ্রষ্টদের সামনে রাখা হইয়াছে। কিন্তু যাচিত ফল পাওয়া যায় নাই। তাড়নার দ্বারা মানুষ সব মনোবৃত্তিকে বশে আনিতে পারে নাই। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব একথা যখনই ভাবিয়াছে তখনই তাহার তথাকথিত বিবেক ও

অহমিকা ঊর্দ্ধলোকে উঠাইবার জন্য নানা ভাল ও মন্দের আবিষ্কার করিয়াছে। কাল্পনিক স্বর্গের পথ সহজ করিবার জন্য কত রকমের আত্মনির্য্যাতন উদ্ভাবিত হইয়াছে। তথাপি মানুষ কতক পরিমাণে পশুই থাকিয়া গিয়াছে—ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ মোহান্ধ হইয়া নিজের সফলতা জাহির করিয়াছেন কিন্তু সাধারণে তাঁহার সাধনা অথবা সফলতা কোনটাই ধরিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য মানুষ ভয় ও শক্তিকে নানা রূপ দিয়া পূজা করিয়াছে—ইহাতেও কুলায় নাই, অবশেষে পরম শক্তিকে নিরাকার করিয়াছে, নিগু'ণ করিয়াছে, অসীমের মধ্যে ফেলিয়াছে—তথাপি সেই অজানা বিরাট শক্তি সৃষ্টি-রক্ষার্থে প্রাকৃতিক নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইতে দেয় নাই—মানুষ আইনের পাহারা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। যে কামকে মানুষ পশুবৃত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছে তাহারই নীতিসম্মত ব্যবহারকে ধর্ম্মের সহিত জড়াইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কথাটী পুরানো এবং ইহার ব্যবহার ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট কিন্তু ধর্ম্মের বাহিরে এবং ভিতরে পুত্র সম্ভাবনার প্রকরণ এক, কেবল পাত্রের পার্থক্যে এক ক্ষেত্রে মহাপাতক, অপর ক্ষেত্রে পুণ্যার্জ্জনের হেতু হইতেছে।

(৫)

জঙ্গল

পেশীবহুল দীর্ঘ দুইটী পা মাঠের মাঝে উট পাখির মত চলিয়াছে। সোজা তাহার গতি নয়। খানিকটা পথ চলিয়াই বামে অথবা দক্ষিণে হঠাৎ বাঁকিয়া যাইতেছে—পা দুইটী মহেন্দ্রের। জঙ্গলে যাইবার সময় সে কখন একটী নির্দ্দিষ্ট পথে হাঁটে না, পাছে চলিতে চলিতে গম্য স্থানটীর দিকে একটী নির্দ্দিষ্ট পায়ে চলা রাস্তা হইয়া যায়।

পালদীঘির প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বৃহৎ গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে বিস্তৃত জলরাশি দেখা যাইতেছে। দীঘিটি অতি প্রাচীন ও বিরাট, অপর পাড়ের মানুষ চেনা যায় না। স্থানে স্থানে এখন লাল পাথরের বাঁধান ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। কালের ধ্বংসলীলায় বেশীরভাগ পাথরই স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। কোন কোনটীকে অশ্বত্থের শিকড় তাহার কল্পনাতীত শক্তির দ্বারা ফাটাইয়া দিয়াছে। জলের নিকটের ধাপগুলি ঘন শ্যাওলায় সবুজ ও পিচ্ছিল হইয়া আছে, সন্তরণ জানা না থাকিলে ঘাটে নামিতে ভয় আসে—সামান্য অসাবধানতাতেই অতল জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ঘাটের নিকটে

সব সময়েই বৃহদাকারের হেলে সাপ ঘুরিয়া বেড়ায়—ফাটলগুলি পরীক্ষা করিয়া চলিয়া যায়—ছোট মাছ ও ভেক ফাটলগুলিকে আশ্রয় ভাবে বলিয়া।

মহেন্দ্র দক্ষিণ পাড়ে আসিয়া বসিল। স্থানটী গাছের ছায়ায় শীতল হইয়া আছে—পাশেই অতি বৃদ্ধ বট। বটের তলায় এখন দুই চারিটী শালগ্রাম শিলা ও ভগ্ন দেব দেবীর মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। পাড়ে বসিয়াই ব্যাগ:হইতে কোমরবন্ধটী পরিয়া হস্তস্থিত ভরা পিস্তল নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুঁজিয়া দিল, তাহার পর ফ্লাস্কের অবশিষ্ট জল পান করিয়া ঘাটে নামিল ফ্লাস্কটী পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য। জুতা খুলিতেই নিজের পায়ের আকৃতি দেখিয়া চমকিত হইল। অনেকক্ষণ গরম জল ও চামড়ার ঘর্ষণে পা দুইটী প্রায় হাজিয়া গিয়াছে। ঘাটে বসিয়াই যতটা সম্ভব শব্দ না করিয়া মুখে কানে জল দিয়া দাঁড়াইতেই নরম মোটা শ্যাওলার উপর বড় বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইল। চিহ্নটী ঠিক টাট্‌কা নয়, কারণ শ্যাওলাগুলি অনেকটা সোজা হইয়া আসিয়াছে, আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেই নিশ্চিত হইল এ বেটা সেই খোঁড়া। পিছনকার পায়ের চিহ্নটা পুরাপুরি পড়ে নাই, হয়ত বিষাক্ত কাঁটা ফুটিয়া চিরকালের জন্য জখম করিয়া দিয়াছে। বাঘের থাবা দেখিয়া মহেন্দ্র ভয় পায় নাই, বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিল আজ তাহা হইলে জন্তুটা সিন্দুকের পাশেই আস্তানা গাড়িয়াছে। গাছে উঠিয়া কাঠে কাঠে ঠুকিয়া শব্দ না করিলে বেটা স্থানটী ত্যাগ করিবে না। গাছে ওঠা কার্য্যটী খুব প্রীতিকর নয়। গত্যন্তর না থাকায় মহেন্দ্র বটের শাখায় উঠিয়া পাতার আড়াল হইতে শব্দ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময়ে দেখিল বনের রাজা নির্জ্জীবের মত সিন্দুকটার পাশেই পড়িয়া আছে, মাথার কাছটায় অনেকখানি জায়গা লইয়া রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল। বাঘের মৃতদেহ দেখিয়া শুধু স্তম্ভিত হয় নাই—মানুষের উপস্থিতিতে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অনুমতি না লইয়া এ জঙ্গলে শিকার করিতে আসিল কে? পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, যে বাঘ মারিয়াছে সে যে নিকটেই নাই তাহার কি প্রমাণ আছে এবং বাঘ মারার সহিত যে অন্য উদ্দেশ্য নাই তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? মহেন্দ্র গাছের উপর বসিয়াই বাঘের মৃত্যুর সঠিক কারণ খুঁজিতেছিল। বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কোন মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। মহেন্দ্র কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, ব্যাঘ্রহন্তা সদলবলে চলিয়া গিয়াছে তাহার অনুমতি পত্র আনিবার জন্য। সে দল ভাবিল এই জন্য যে এ জঙ্গলে মহেন্দ্র ব্যতীত আর কোন মানুষ একলা আসিতে সাহস পাইবে না। সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল ভাবিয়া ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিয়া আসিল। মাটিতে নামিয়াই

পিস্তলটী হাতে লইয়া হত জন্তুটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে মনুষ্য পদচিহ্ন খুঁজিতে লাগিল। বহু মানুষ দূরের কথা একটীরও অস্তিত্বসঙ্কেত দেখিতে পাইল না; অদ্ভুত লাগিতেছিল—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়।

বাঘের নিকটে আসিয়া তাহার থাবা নাড়িয়া দেখিবার প্রয়োজন হইল না। পেটটী ফুলিয়া প্রকাণ্ড হইয়াছে—অন্ততঃ দশ বারো ঘণ্টা আগে গুলি না খাইলে এতটা পেট ফুলিতে পারে না: মহেন্দ্র নিজের মাথাটা চুলকাইয়া জন্তুটার চতুষ্পার্শে মনুষ্য পদচিহ্ন খুঁজিতে লাগিল। কোথাও কিছু নাই। মহেন্দ্র নিশ্চিত বুঝিল, যে বাঘ মারিয়াছে সে শিকারের উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসে নাই। শিকারের জন্য আসিয়া থাকিলে অতবড় বাঘ মারার পর একবার অন্ততঃ উপযুক্ত সময়ে নিকটে আসিয়া গুলি যেখানে টিপ্ করিয়াছিল ঠিক সেখানেই লাগিয়াছে কিনা দেখিত। তা ছাড়া বাঘকে লইয়া যাইবারও কোন চেষ্টা নাই। শিকারী অনুমতি-পত্রের জন্য যদি নিজেও জঙ্গল ছাড়িয়া গিয়া থাকে ত মৃত বাঘকে পাহারা দিবার জন্য কতকগুলি মানুষকে জন্তুটার নিকট বসাইয়া যাইত। যে বাঘ মারিয়াছে তাহার নিজের লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। বাঘ মারিয়াছে এক গুলিতে এবং গুলিও মস্তিষ্কের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। যাহার লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে অতখানি বিশ্বাস আছে সে অভিজ্ঞ শিকারী। যে অভিজ্ঞ শিকারী সে জঙ্গলের অন্য জন্তুর স্বভাবের খবর রাখে। বাঘের গন্ধে অন্য জন্তু কাছে না আসিলেও হায়েনা এবং কুকুর ত মৃত বাঘকে ছাড়িয়া দিবে না। সুযোগ পাইলেই টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিবে। বিরাট ব্যাঘ্র শিকার করিয়া তাহার চামড়া সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকা কোন শিকারীর পক্ষে সম্ভব নয় সুতরাং যে বাঘ মারিয়াছে সে একেলাই জঙ্গলে ঢুকিয়াছে এবং শিকারের উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই। এতটা ভাবিতে মহেন্দ্রের টনক্ নড়িল—উদ্দেশ্য সহজ নয়। লোকটা যে নিকটেই কোন গুপ্ত স্থান হইতে মহেন্দ্রের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে-না তাহার নিশ্চয়তা কি আছে। মহেন্দ্র সিন্দুকটা আর একবার দেখিয়া সেই স্থান হইতে সাম্নে মুখ রাখিয়াই পিছু হাঁটিতে লাগিল। মহেন্দ্রের এখন আর সন্দেহ বলিয়া কিছু মনকে নাড়া দিতেছে না। তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে শার্দ্দূল-ঘাতক তাহার আশে পাশেই ঘুরিতেছে এবং ইহাও সম্ভব যে সে গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছে।

মহেন্দ্র যখন বাঘের দিকে মুখ রাখিয়া পিছন দিকে এক পা, দুই পা করিয়া চলিতেছিল সেই সময় একটী সন্দেহজনক শব্দ শুনিল। কাশি আসিলে মানুষ জোর করিয়া চাপিবার চেষ্টা করিলে যে রকম আওয়াজ হয় ঠিক সেই রকম

আওয়াজ অতি নিকটে উত্তর কোণ হইতে আসিল। শব্দটা মহেন্দ্রকে যেন দারুণ ভাবে একটা ভারি লোহার দ্বারা আঘাত করিল। ক্ষণিকের জন্য মহেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—হৃদস্পন্দন তাহার সর্ব্বদেহ কাঁপাইয়া দিল। আত্মসংযম তাহার নাই, মুহূর্ত্তে শব্দ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়া ধরিল। তাহার পর একেবারে নিস্তব্ধতা! মহেন্দ্র এই সুযোগে পিস্তলের অধিকন্তু বাঁটটি পরাইয়া লইল, আগ্নেয় অস্ত্রটী দাঁড়াইল একটী ছোটখাট রাইফেলের মত।

প্রায় একদণ্ডের চতুর্থাংশ কাটিয়া গিয়াছে, কোন জীবিত প্রাণীর সাড়া নাই। মহেন্দ্র নিশ্চল ভাবে একই স্থলে দাঁড়াইয়া আছে, একটু নড়িলেই শত্রু তাহাকে দেখিয়া ফেলিতে পারে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গভীর অরণ্যে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা কি সাংঘাতিক জিনিস তাহা অভিজ্ঞতা না থাকিলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এতটুকু বাতাস নাই, গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। গুমট ভাব নিস্তব্ধতাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। বিরাট দৈত্যের মত বনস্পতিগুলি দাঁড়াইয়া আছে—প্রাণবান তথাপি তাহাদের কঠিনতা দেখিলে মনে হয় একটী প্রেতলোকের অচল পাহারা, সান্ত্রীর মত দাঁড়াইয়া শত শত বাহু বিস্তার করিয়া নবাগত পথিককে বলিতেছে—ফিরিয়া যাও, তফাৎ যাও। সময় কাটিতেছিল, মহেন্দ্রও পাথরের মত দাঁড়াইয়া ছিল। মহেন্দ্রের সন্দেহ রহিল না শার্দ্দূলহস্তা নরঘাতক হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই মত নিকটে কোন কিছুর আড়ালে শব্দের অপেক্ষা করিতেছে। মহেন্দ্র একটী মোটা তেঁতুল গাছের গোড়ায় দাড়াইয়া ছিল,—গোড়াটা বেশ চওড়া। নীচু হইয়া তিনটী ডাল তুলিয়া লইয়া একটু দূরে পরের পর শুক্‌না পাতার উপর সেগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। শুক্‌না পাতার উপর ডালগুলি পড়ায় কোন জীবের গতিশীল শব্দের মতই শুনাইল। পরীক্ষায় মহেন্দ্র অপ্রত্যাশিত ফল পাইল। মহেন্দ্র যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই ঘটিয়াছে। যেদিকে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি উঠিল ঠিক সেই দিক হইতে পরক্ষণেই রাইফেল হস্তে একটী মানুষ বাহির হইয়া আসিল,—আপাদমস্তক কালো বোর্‌খার মত পোশাকে আবৃত, কেবল চোখ দুইটীর কাছে দুইটী ছিদ্র। মহেন্দ্রকে সে এখনও দেখিতে পায় নাই, কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের মুখটা সেই দিকে ধরিয়াছিল। রাইফেলধারী ও মহেন্দ্রের মাঝে যেটুকু ব্যবধান তাহাতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বোর্‌খা-বেশযুক্ত মানুষটীর সময় লাগিবে না। মহেন্দ্র ভাবিল আর সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই, তাহার মাথাটা আন্দাজ করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু মাথা উড়াইয়া দিবার চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করা অত সোজা নয়,

কারণ গুলি চালাইতে হইলে পিস্তলের নলের ডগা গাছের পাশ হইতে খানিকটা বাহির করিতে হইবে এবং টিপ করিতে হইলে মহেন্দ্রের মাথাও খানিকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যে মানুষ সামনে বাঘ দেখিয়াও ঠিক থাকে এবং দুই চক্ষুর মাঝে অব্যর্থ লক্ষ্য করিতে পারে তাহার নিকট মাথার সামান্য অংশই নিশানার পক্ষে যথেষ্ট। মহেন্দ্র নিজেকে নিরাপদ না করিয়া নড়িতে চাহিল না। সে আড়াল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইলেও কতকটা আশ্বস্ত হইবার উপক্রম করিতেছিল—হঠাৎ সে ঠিক করিল, আমি মরি ক্ষতি নাই কিন্তু পাল রাজাদের গুপ্তধন মহেন্দ্র পাল ব্যতীত আর কেহ ভোগ করিবে না। চাবি কোমরেই গোঁজা ছিল, সন্তর্পণে পায়ের তলায় ফেলিয়া দিল। শক্ত মাটীর সহিত ধাতুর সংস্পর্শে যে শব্দ হইল তাহাতেই আর একটী নূতন জীবের আগমনের কারণ ঘটিল। উভয়ের মধ্যস্থলে বাঘিনীর হুঙ্কার শুনা গেল। সেই মুহূর্ত্তেই গুড়ুম করিয়া অজানা ব্যক্তি একটা গুলি চালাইয়া দিল। পরক্ষণেই বাঘিনী মহেন্দ্রের প্রায় পায়ের তলায় আহত দেহ লইয়া পড়িল। মহেন্দ্রের পক্ষে আর আড়ালে থাকা সম্ভব হইল না কারণ বাঘিনী তখনও জীবিত, এক মুহূর্ত্ত দেরি হইলে তাহাকে আক্রমণ করিবে। মহেন্দ্র থাবার নিকট হইতে এক লম্ফে পিছাইয়া আহত জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিল। নিকট হইতে গুলি লাগায় মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া গুলিটা হাত খানেকের মধ্যে খানিকটা চাঁই তুলিয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

বাঘিনী মরিল, এইবার মানুষে মানুষে বোঝা পড়ার পালা। রাইফেলধারী কিন্তু ইহার ভিতরই অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রের নিকট সব কিছুই ভৌতিক ব্যাপারের মত লাগিতেছিল! অতি সাবধানী মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, আততায়ী তাহার সন্ধানে আসিয়াছে। নিশ্চয় গুপ্তধনের খবর সে রাখে। মহেন্দ্রকে মারিলে যে উদ্দেশ্য লইয়া সে আসিয়াছে তাহার সফলতা অসম্ভব হইয়া যাইবে, সেই কারণেই লোকটা তাহাকে বাঁচাইয়াছে। ইহার পর কোন কারণেই সিন্দুকের নিকট যাওয়া উচিত হইবে না। সংক্ষেপে লোকটা মহেন্দ্রের ক্রিয়া-কলাপ জানিতে আসিয়াছে, মহেন্দ্রকে মারিতে নয়। লোকটা মহেন্দ্রকে চিনিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্রের পক্ষে সন্দেহ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এই জঙ্গলের মাঝে তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে কোন উন্মাদ অথবা—উন্মাদ ছাড়া আর যাহাকে সন্দেহ করিল সে ত হাসপাতালের রোগী,—অসম্ভব! সব কিছুই মহেন্দ্রের নিকট রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল।

ইতিমধ্যে কালো মেঘ ঈশান কোন হইতে বিতাড়িত হইয়া মাথার উপর

জমা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঝড় উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। ঝড় উঠিলেই বাঘের দল ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিবে—এই অঞ্চলেই ত দশ-বারোটা আছে; সুখী জানোয়ার, দেহে এক ফোঁটা জল পড়িলে অস্থির হইয়া উঠে। বড় বাঘকে অতটা ভয় না থাকিলেও ধূর্ত্ত ও ভয়ঙ্কর লেপার্ডের কবল হইতে নিস্তার নাই। উহাদের গতির কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। মানুষকে একলা পাইলেই উহারা আক্রমণ করে। ঝড়ের বেগে গাছে গাছে ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইলেই বরাহের দলও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে না, দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ছুটিতে থাকিবে। এই জন্তুর সাম্‌নে পড়িয়া গেলে দেহটা যে বিভক্ত হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র একই স্থলে দাঁড়াইয়া সব কয়টা বিপদের আশু সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতেছিল।

ঝড় উঠিতে আর দেরি নাই। দূরে গাছের ফাটল নির্গত ভীতিপ্রদ গোঙানীর শব্দের মত সঙ্কেত সে শুনিয়াছে - ঐ শব্দ অসংখ্য প্রেতবাসীর মিলিত আহ্বানের মত সমস্ত বনানীর জীবকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিবে। এতখানি ফাঁকায় দাঁড়াইয়া থাকা আর উচিত নয়। মহেন্দ্র কাছাকাছি একটা ঝোপ ঠিক করিয়া দ্রুত সেই দিকে সরিতে যাইবে এমন সময় প্রায় পিছন দিক হইতে শুকনা পাতার উপর খস্‌খস্ শব্দ হইল। জঙ্গলের বহুদিনের অভিজ্ঞতা মহেন্দ্রকে সতর্ক করিয়া দিল। পদশব্দ মানুষের, সব কয়টা হিংস্রজন্তু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। হঠাৎ মহেন্দ্র একেবারে উল্টাদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাত্র কয়েক গজের ভিতর সেই বোর্‌খা পোশাকধারী রাইফেল হস্তে কি একটা আদেশ করিবার জন্য বীরের মত দাঁড়াইয়াছে, মুখ দিয়া একটা শব্দের উচ্চারণ হইয়াছিল, তাহার অর্থ বোধগম্য হইবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্রের হস্তস্থিত ভরা পিস্তল ছুটিয়া গেল—অজ্ঞাত ব্যক্তির রাইফেলটা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র যেন ঐন্দ্রজালিকের ক্ষমতা লইয়া বিপরীত দিকে মুখ রাখিয়াই টিপ করিয়াছিল এবং চোখের পলক না পড়িতে আততায়ীর দিকে ফিরিয়া ঘোড়া টিপিয়া দিল।

রত্নানুসন্ধানীর কি দুর্দ্দান্ত সাহস, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও বোর্‌খার উপর কোমরবন্ধ হইতে রিভল্‌বার বাহির করিতে যাইতেছিল। মহেন্দ্র গুরুগম্ভীর গলায় আদেশ করিল, হাত তোল। আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে পিস্তলটা আবার ছুটে যাবে। অজ্ঞাত ব্যক্তিটি হাত তুলিল।

মহেন্দ্র লোকটা কে জানিবার জন্য মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তলটা ধরিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়াই সজোরে মুখের উপর চপেটাঘাত করিল।

একটি চড়ে মুখের আব্রু শতছিন্ন হইয়া গেল—বীভৎস মুখের অর্দ্ধাংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মানুষটী আমাদের পুরাতন দারোগাবাবু। মহেন্দ্রের নিকট শংকর মাছের চাবুক খাইয়া যেসব স্থান গভীরভাবে কাটিয়া গিয়াছিল তাহা ডাক্তারী রিপুকর্ম্মের মোটা মোটা রক্তাভ রেখা লইয়া মহেন্দ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ঠোঁট দুইটির সঙ্গমস্থল খানিকটা বাঁকিয়া নীচু দিকে নামিয়া গিয়াছে। আকৃতি তাহার কতকটা জোড় লাগা পোড়া মাংসের মত। কাটা মাংস জুড়িয়া গিয়াছে তথাপি জোড়া স্থানটি এত লাল যে দেখিলে মনে হয় কথা বলিবার চেষ্টা করিলে এখুনি হয়তো সেলাইটী খুলিয়া যাইবে।

মহেন্দ্র দারোগাকে দেখিয়াই চিনিল। তাহার পর বজ্রমুষ্টি নিষ্পেষিত করিয়া পিশাচের আনন্দোচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিল—মহেন্দ্রের মুখে হাসির আবির্ভাব হইয়াছে—কি বিকট দৃশ্য তাহার।—শব্দ নাই, শুধু ওষ্ঠের রেখা ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই মনে হইতেছে মহেন্দ্র জীবন্ত দারোগাকে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রের চোয়ালের মাংসপেশীগুলি কড়া হইয়া উঠিল, দন্তে দন্তে কি সাংঘাতিক ঘর্ষণ, যেন যাঁতার তলায় মটর চাপা পড়িয়াছে।

মহেন্দ্র বলিল—হুঁ, যা ভেবেছিলাম্ ঠিক তাই। কোন ডাক্তার তোমার চিকিৎসা করেছিল? তোমার তো বাচবার কথা নয়; চাবুকটা পুরাণো হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণেই—আমার আবার পিছু নিয়েছ। আমার পিছু নিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় নি। আমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলে কেন? মহেন্দ্র এবার তাহার নিকটে আসিল—দারোগা পূর্ব্বাবস্থাতেই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অকস্মাৎ অদ্ভুত কৌশলে তাহার পাঁজরার তলদেশ টিপিয়া ধরিল। তখন দারোগার মুখ দেখিলে যে কোন লোক অনুমান করিতে পারিত—শূলে চড়াইয়াও মানুষ বোধ হয় মানুষকে এতটা যন্ত্রণা দিতে পারে না। যন্ত্রণায় দারোগার চোখ দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছিল। মাথাটা একদিকে হেলিয়া পড়িতেছিল, যেন গলায় দড়ি দিবার পরের অবস্থা। দারোগার গলা হইতে একটা ঘর্-ঘর্ করিয়া শেষ নিঃশ্বাসের মত শব্দ হইল। ঠিক এই সময় দারোগার কোমর বন্ধ হইতে অতি সহজে রিভল্‌ভারটী বাহির করিয়া মহেন্দ্র পার্শ্বের ঝোপে ছুঁড়িয়া দিল। দারোগা এখন নিরস্ত্র। ঝোপে ছোট আগ্নেয়াস্ত্রটী ফেলিয়া ঝোপটার দিকে আড়চোখে তাকাইতেই মহেন্দ্র আবিষ্কার করিল রাজবিছুটীর লতা। পিশাচের ক্রিয়াকরণের কতক উপকরণ যেন ঐ ঝোপটীতে রক্ষিত ছিল। লতাটী একে বহুদেহ গ্রহণ করিয়া বিষধরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাভাবে ঝোপটীকে জড়াইয়া আছে—কি নিবিড় বেষ্টন তাহার—লোল বিষাক্ত

জিহ্বা লুক্কায়িত রাখিয়া বন্তের দেহ স্পর্শের কি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। বিষধরের সহায়তা লইবার জন্য মহেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র পিস্তলের মুখ দারোগার দিকে রাখিয়া এক পা, এক পা করিয়া পিছাইতে আরম্ভ করিল। ঝোপ পায়ে ঠেকিতেই বৃশ্চিকের দংশনের মত মনে হইয়াছিল, ভ্রূক্ষেপ করিল না, মহেন্দ্র সন্তুষ্ট হইল যথাস্থানে আসিয়াছে বলিয়া। পকেট হইতে ছোট ভিজা তোয়ালেটা

দারোগা

বাম হস্তে বাহির করিয়া কোনপ্রকারে এক হাতেই তাহার, তালুর উপর জড়াইয়া লইল। লতার স্পর্শজ্বালা তাহাকেও কিয়দংশ ভোগ করিতে হইল, তথাপি তোয়ালের সাহায্যে একরাশ কণ্টকযুক্ত লতা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া

পড়িল। লতাগুলি লাউডগা সাপের মত লিকৃলিক্ করিতেছিল। লাউডগা সাপের বিষ নাই কিন্তু রাজবিছুটি বিষধর। তাহার কাঁটা বিদ্ধ হইলে যে কোন প্রাণীকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে। মহেন্দ্র কণ্টকপূর্ণ বিষধর লতার দ্বারা সশস্ত্র হইয়া পুনরায় দারোগার দিগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দারোগাবাবু আসামীকে দোষ কবুল করাইবার অনেক পন্থাই জানিতেন কিন্তু কাঁটা ও শুঁয়ো পোকার মত আভরণের মত রাজবিছুটি যে কি করিতে পারে সে খবর তাঁহার জানা ছিল না।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল—এই লতাকে তুমি চেন? দারোগা নির্ব্বাক।

মহেন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল,—কে তোমাকে জঙ্গলের খবর দিয়েছিল? শঙ্কর মাছের চাবুকের দাগ এখনও মুখে রয়েছে তবু তোমার শিক্ষা হয়নি? দারোগার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। মহেন্দ্র রাগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—মুখের সামনে লতাটা ধরিয়া বলিল—উত্তর দাও নইলে এখুনি তোমার চোখে মুখে লতা ঘসে দেব। তারপর কি হবে জান? তোমার গৃহলক্ষ্মী তোমাকে চিনতে পারবেন না; চোখে দেখতে পাবে না, কানে শব্দ পৌঁছবে না। নিঃশ্বাস নিতে হাঁপ ধরবে, তবু তুমি বেঁচে থাকবে।

এখন বল আমাকে বাঁচালে কেন? আমি জানি শুধু আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি বাঘ মারনি, তার চেয়ে অনেক বড় মতলব তোমার মাথায় ছিল। গুপ্তধন? আমাকে জেলে পুরতে পারনি বলে কর্ত্তাদের বকুনি খেয়েছ। চাবুকের শোধ তুলতে এসেছ?—কোন উত্তর নাই।

মহেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, পারিপার্শ্বিক সব ঘটনার কথা মহেন্দ্র ভুলিয়াছে। অট্টহাসির বিকট প্রতিধ্বনি দীঘির পাড়ে পাড়ে ঘুরিতে লাগিল—মহেন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিল দারোগা ছাড়া অন্য ভয়ঙ্কর জীবকে সে আহ্বান করিয়া আনিতেছে তাহারই উচ্চ হাসিয়া দ্বারা। সে এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল—সমস্ত দেহটা বন্দুকের নলের মতই সটান হইয়া গিয়াছে,—মহেন্দ্র নিজেই যেন একটা বারুদাধার। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আদেশ করিল—জামা খোল, কোন চালাকি করবার চেষ্টা ক'র না, গুলি করব। দারোগা আদেশ মানিল। যে সময় দারোগা জামা খুলিতেছিল সেই অবসরে মহেন্দ্র সামনের দিকে মুখ রাখিয়াই সামান্য পিছাইয়া আসিল, তাহার পর সন্তর্পণে পিস্তলটা মাটিতে রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ দারোগার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এইটুকু সময়ের মধ্যে মহেন্দ্রের আকৃতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কে বলিবে সে একটা

জীবন্ত মানুষ, অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন যেন কোন দৈত্য মহেন্দ্রের উপর ভর করিয়াছে।

অতি ক্ষিপ্রতাসহ মহেন্দ্র দারোগার দুইটী হাত পিছন দিকে টানিয়া লইল, কোটটি তখন দুই হাতের ডগায় আটকাইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মত মহেন্দ্র কোটটি উল্টাইয়া দারোগার সামনের দিকে ফেলিয়া দিল। এই অবস্থায় কনুয়ের পিছন দিকে হাঁটু রাখিয়া জোর করিয়া জোড়ের উল্টা দিকে টান মারিতেই সশব্দে হাড় খুলিয়া অপর হাতটীরও এই অবস্থা হইল, চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে। দারোগার দুই হস্তের কব্জির সামনে তখন কোট্‌টা আটকাইয়া আছে, সামান্য নড়িবার চড়িবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। এইবার মহেন্দ্র সামনে আসিয়া কোট্‌টি নিজে খুলিয়া লইল। তলার হাত দুইটী কেবল মাংসের বাঁধনে ঝুলিতেছিল কারণ উপরকার হাড়ের সহিত নীচের হাড়ের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার পর সামনে হইতেই উর্দ্ধবাহুর অনুকরণে দুইটী হাতই উপর দিকে তুলিয়া পিছন দিকে অদ্ভুত কৌশলে হাতে হাতে কব্জা লাগাইয়া দিল। দারোগার আর পিছন হইতে সামনে হাত আনিবার উপায় রহিল না। হাড় খোলার বেদনা এতক্ষণে আসিয়াছে। দারোগার সহ্য শক্তি অসাধারণ তথাপি সে নীরব থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, মাগো। এই ধরনের করুণ আর্ত্তনাদ মহেন্দ্র শুনিতে ভালবাসে। একটু মুচকি হাসিয়া আবার বলিল—গুপ্তধনের খবর নেবে না? আমাকে আবার গ্রেপ্তার করবে না? আর একবার—'মা গো' বল, তোমার গলা থেকে গোঙানী আমার শুনতে ভাল লাগে। দারোগা নীরব কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিয়া চলিয়াছে। সামান্য নড়িবার চেষ্টা করিলে কনুই দুইটার বেদনা অসম্ভব রকমের বাড়িয়া উঠিতেছে।

মহেন্দ্র উত্তরের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। উত্তর আসিল না তখন লতা লইয়া সত্যই সে কপালে, গালে ও বুকের উপর ঘসিয়া দিল। ঘসিয়া দিল বলিব না, একেবারে থেত্‌লাইয়া দিল; কতকগুলি কাঁটা ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধেক হইয়া মাংসের ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

খানিকটা সময় কাটিবার পর মহেন্দ্র কঠোর ও অধীর হইয়া বলিল—কি রকম লাগছে বন্ধু? ফাঁকি দিয়ে পৃথিবীতে অনেক আনন্দ ভোগ করেছ, সামান্য দাম চাইছি দেবে না—কেবল দুটো কথার খাঁটি জবাব দেবে না? তোমার সংসার আছে, পুত্র-কন্যা আছে, স্ত্রী আছেন—সকলে তোমাকে ভালবাসে, শান্তিতে জীবনটা কাটিয়েছ, গ্রামের লোকগুলোও তোমাকে ভালবাসে, ভয় করে, কর্ত্তব্যজ্ঞান তোমার ভয়ানক কড়া সেই জন্যে, না? তোমাকে যখন চাবুক

কসিয়েছিলাম তখন সব ক'টা লোক তোমার পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু তাদের উল্টো মত জবানবন্দীতে লেখা হয়ে গিয়েছিল—কি করে জান না? টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। তোমার কাছেও উড়ো চিঠি দিয়েছিলাম, তুমি ভ্রূক্ষেপ করনি। কর্ত্তব্য জ্ঞান তোমাকে সব দিক দিয়ে বেঁধেছিল। এখন তোমার ভালবাসার লোকগুলি কোথায়? ভালবাসা, ভালবাসা, হাঃ হাঃ হাঃ। এই সময় ঘটনাস্থলটিতে কেহ উপস্থিত থাকিলে বুঝিতে পারিত রাক্ষসের অট্টহাসির ভিতর দিয়া কতখানি অন্তর্জ্জ্বালা বাহির হইয়া আসিতেছিল। মহেন্দ্রের হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল। সে বলিয়া চলিল—আমিও তোমার মতই শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিলাম, আমিও ভালবেসেছিলাম, কিন্তু দয়া ও ভালবাসার প্রতিদানে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পাইনি! পরে বুঝলাম শান্তি আমার জন্যে নয়, তোমার মত কতকগুলো—যাক্ মহেন্দ্র বক্তব্যটা সম্পূর্ণ না করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—আমার কথার উত্তর দাও।

জ্বালা ও ব্যথার যন্ত্রণা অবিরাম বাড়িয়া চলিয়াছে। মহেন্দ্র কি বলিতেছিল দারোগা হয়ত তাহা শুনিতে পায় নাই। কথা বলিবার শক্তিও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। জিহ্বার লালা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। তৃষ্ণায় তালু সম্পূর্ণ শুকাইয়া গিয়াছে। দারোগার যে দৃষ্টিতে কিছুকাল আগে প্রতিহিংসার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রতিহিংসার উত্তেজনায় মহেন্দ্রের মোটা টাকার উৎকোচ প্রত্যাখ্যান করিয়া মৃত্যুকে বরণপূর্ব্বক এই ভয়াবহ জঙ্গলে মহেন্দ্রের পিছু নিয়াছিল তাহাকে আইনের সামনে দণ্ডিত করিবার জন্য, সে দৃষ্টি এখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। দৃষ্টি নিতান্তই কাতর, দয়ার প্রার্থী।

মহেন্দ্র দারোগার এই অসহায় অবস্থায় দৃক্‌পাত মাত্র করিল না। তাহার প্রকৃতি অদ্ভুত; কোপ উদ্দীপিত হইয়া উঠিলে তাহা নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি তাহার নিজেরই থাকে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাগের পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়। প্রকাশভঙ্গিও অবর্ণনীয়, সব বাধাই তাহার নিকট তুচ্ছ।

মহেন্দ্র এইবার দারোগার চিবুক ধরিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিল—প্রেয়সি, এইবার বল আমার পিছু নিয়েছ কেন? জঙ্গলের সন্ধান তোমাকে দিল কে?

দারোগার তখন চক্ষু মুদ্রিত, কথা বলিবার শক্তি এক রকম নাই বলিলেই চলে। হাতের ব্যথা ও লতার রসের জ্বালায় ক্ষণে ক্ষণে বমন আসিতেছে—জড়িত ভাষায় কোন প্রকারে বলিল,— আমাকে গুলি ক-ক- করো, বড্ড কষ্ট, দোহাই গুলি কর!

মহেন্দ্র দারোগার চিবুক ধরিয়াই ছিল—মৃদু নাড়া দিয়া বলিল, সে কি, এত

সহজে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি? তোমাকে যে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ছি তোমাকে গুলি করলে যে পৃথিবী থেকে একটী আদর্শ প্রাণী কমে যাবে।

কথা বলার সহিত অন্যমনস্কভাবে মহেন্দ্রের মুষ্টি দারুণ ভাবে নিষ্পেষিত হইতেছিল—সে হাতে জ্বালা অনুভব করিল। প্রাণবান বিষধর লতা শক্তিমান মহেন্দ্রকেও গ্রাহ্য করে নাই। মুষ্টির নিষ্পেষণ কালীন তাহার অজ্ঞাতে লতার বিষাক্ত রস হাতের প্রতিটী লোমকূপের সহিত নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে,—মুঠি আপনা হইতে শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। মহেন্দ্র বুঝিল অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল পরে বাম হস্তের ব্যবহার কিছুকালের মত বন্ধ হইয়া যাইবে। আর দেরি করা চলে না। দারোগার নিকট হইতে পিছাইয়া আসিয়া পূর্ব্বরক্ষিত পিস্তলটী মাটি হইতে তুলিয়া লইল, তাহার পর দারোগার কপালে নল স্পর্শ করাইয়া বলিল—সময় নেই, দুই মিনিটের মধ্যে তোমার আর্জি মঞ্জুর করে দেব যদি এই সময়ের ভিতর না বল কে তোমাকে জঙ্গলের সন্ধান দিল।

পিস্তলের নলের স্পর্শে দারোগা চমকিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত আগে গুলির দ্বারাই মৃত্যুভিক্ষা চাহিয়াছিল কিন্তু লোহার হিমবৎ স্পর্শে যখন বুঝিল মৃত্যু তাহার কপাল ছুঁইয়াছে তখন বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিল না,—ভাবিল, হয়ত অসহ্য যন্ত্রণাও সহনীয় হইয়া আসিবে যদি মহেন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। দারোগার শরীর তখন টলিতেছে, দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতা নাই। মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধাঙ্গ এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ অনির্ভরশীল পা দুইটার উপর কোন প্রকারে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু আর পারিল না; পিস্তলের নলটার উপরই ঝুঁকিয়া পড়িল।

মহেন্দ্রের পৈশাচিক জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে কখনও কাহাকেও সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, কারণ মানুষকে অতি মাত্রায় বিশ্বাস করাতেই তাহাকে পিশাচ হইতে হইয়াছে। পিস্তলের উপর ঝুঁকিয়া পড়াতেই মহেন্দ্র ভাবিল দারোগা হয়তো কোন কৌশলের চেষ্টায় আছে। সে হঠাৎ অনেকটা পিছাইয়া গেল। পিস্তলের নলের ঠেকাতেই দারোগা এতক্ষণ দৈহিক ওজনের সমতা ঠিক রাখিয়াছি। পিস্তলের ঠেকা সরিয়া যাওয়াতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। ঊর্দ্ধাঙ্গের ওজন সামনের দিকে বেশী হওয়াতে কাঁটা মানসার ঝোপটার উপর অজ্ঞানের মত সে মুখ নীচু করিয়া পড়িয়া গেল। নিজের উঠিবার ক্ষমতা নাই, পিছনে হাত বাঁধা। মহেন্দ্র উঠাইয়া বসাইয়া দিল। দারোগার সমস্ত মুখটা কাঁটায় ভরিয়া গিয়াছে। বাম দিকের পাপ্‌ড়ি ও চক্ষু ভেদ করিয়া একটী মোটা কাঁটা সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যে সময় কাঁটা বিঁধিয়াছিল সেই সময়

বোধ হয় চক্ষুর পাপড়ি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না। যে অবস্থায় কাঁটা দৃষ্টিযন্ত্রকে পাইয়াছে সেই অবস্থাতেই তাহাকে বিদ্ধ করিয়া নিজের শক্তির সাক্ষী হইয়া অটল ও সোজা অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; ভীতিপ্রদ দৃশ্য।

উহারই ভিতর একটু ধাতস্থ হইতে দারোগা মাত্র একটী চক্ষুর সাহায্যে মহেন্দ্রকে দেখিল। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাহার, যেন সহস্র অশরীরী মহেন্দ্রের রূপ লইয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া আছে। সে নৃশংসতার বিলাসিতায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—দারোগার মত নির্ভীক মানুষও ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল, বলিল—বলছি, একটু জল দাও।

মহেন্দ্র বলিল,—জল? সে কি হয়! জল খেলে তেষ্টা কমে যাবে যে। এখন কি জল দিতে পারি? আগে বল তারপর জল দেব। এতটা বলিয়া মহেন্দ্র সেখান হইতে উঠিয়া প্রথমেই ব্যস্ততাসহ চাবিটী তুলিয়া কোমর বন্ধের ভিতর দিকে রাখিল, তাহার পর ব্যাগ খুলিয়া জলপূর্ণ ফ্লাস্কটী লইয়া ফিরিয়া আসিল।

দারোগা জলের ফ্লাস্ক দেখিয়া হাঁপাইতেছিল। জল তাহা হইলে সে পাইবে। করুণ দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া হাঁ করিল। মহেন্দ্র দারোগার অতি নিকটে খানিকটা জল ফেলিয়া দিল। অসহ্য তৃষ্ণায় মানুষটী অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, মাটিতে পড়া জল খাইবার জন্যই মুখ নীচু করিল। দুইটী হাতেরই ব্যবহার বন্ধ, শরীর সোজা রাখিবার ক্ষমতা নাই—এমন অবস্থায় নীচু হইতে যাওয়ায় আবার কাদামাটির উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল। মহেন্দ্র পুনরায় তাহাকে তুলিয়া বসাইল তাহার পর স্বর অত্যন্ত নরম করিয়া বলিল,—জঙ্গলের খবর কে দিয়েছে আমাকে সব খুলে বললেই তোমাকে জল দেব, এই দেখ আমার হাতেই রয়েছে। মহেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই খানিকটা জল আবার মাটিতে ফেলিয়া দিল। দারোগা তাহা দেখিল। জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ সিক্ত করিতে গিয়া খানিকটা কাদা মাটি ভিতরে টানিয়া লইল। ভিজা মাটি দারোগার ভাল লাগিল, আর খানিকটা আস্বাদ লইবার চেষ্টা ছিল, মহেন্দ্র জোরে মুখের উপর একটী চড় বসাইয়া দিল। —দারোগার ঠোঁট কাটিয়া গেল; চোখের কাঁটাটা আর খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কাঁটার উপরের অংশ মহেন্দ্রের তালুকেও অব্যাহতি দিল না, ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া গেল।

দারোগা মাত্র একটী উঃ শব্দ করিয়া ঝিমাইতে লাগিল। মহেন্দ্র তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল,—জল দেব। জলের কথা বলিতে দারোগা ঝিমান ভাবের ভিতরেই মুখব্যাদান করিল। মহেন্দ্র সত্যই এবার খানিকটা জল উপর হইতে

গলায় ঢালিয়া দিল। জল খাইয়া জড়িত ভাষায় দম লইতে লইতে বলিতে লাগিল,—আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে বার করেছি। তিন মাসের ছুটিতে রোজ তোমার পিছনে জঙ্গলে এসেছি। সিন্দুকের ভিতর ঢুকতে দেখেছি এবং এর আগে যাদের তুমি এই জঙ্গলে খুন করেছ তাদের জামা কাপড় এবং হাড়ও বার করেছি, কেবল জানতে পারিনি সিন্দুকের ভিতর তুমি অতক্ষণ কি করতে। কালকে তোমাকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করব ঠিক করেছিলাম কিন্তু জিতলে তুমি। ছোট কর্ত্তা আর রাস···বাকি বাক্যটী শেষ হইতে পাইল না, কথা বলিবার একেই ত শক্তি ছিল না তাহার উপর জমাট রক্তের শক্ত আটা ঠোঁট দুইটার নড়া চড়ায় অসুবিধা ঘটাইতেছিল। দারোগা চুপ করিয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল,—আহা বেচারা, রক্তের চাপে ঠোঁট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝি? ছোটকর্ত্তা আর রাসমণির সম্বন্ধে কি বলছিলে? সহানুভূতির উত্তর দিবে কে? দারোগা তখন ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে। চেতনা ঠিক রাখিবার জন্য মহেন্দ্র জোরে পিস্তলের নলটা কপালে ঠুকিয়া দিল, সঙ্গে-সঙ্গে রক্তের ধারায় কপাল, নাক, চোখ, গণ্ড ভরিয়া গেল। মৃত্যুর শোভাযাত্রায় দারোগা ধীরে সজ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। একটী চোখ কণ্টকবিদ্ধ, অপরটীর রক্ত প্লাবনে নিমজ্জিত। দারোগা এইবার পড়িয়া গেল। মহেন্দ্র ভাবিল রোগের শেষ রাখিতে নাই। পরমুহূর্ত্তেই পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়া দিল। দারোগার সব যন্ত্রণার অবসান হইল। মানুষ মারা সোজা কিন্তু লাস গোপন করাই শক্ত। মহেন্দ্র এক মিনিটের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল—এখন কি করা যায়। ঠিক এমনি সময় দমকা হাওয়ায় মহেন্দ্রের চমক্ ভাঙ্গিল, মনে পড়িল হাজিরা দিবার কথা। মাথার উপর আকাশ ঘোলাটে ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের টুক্‌রা ক্ষণে ক্ষণে কুণ্ডলী পাকাইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। মাটিতে হত্যার নৃশংস দৃশ্য, মাথার উপর আকাশ বিভীষিকা দেখাইতেছে। আবেষ্টনী মহেন্দ্রকে সাংঘাতিক ভাবে নাড়া দিল। মহেন্দ্রও ভয় পায়,—একটী একটী করিয়া তিনটী হইল। সময় অপরাহ্ণ পার হইয়া গিয়াছে। যে কোন প্রকারে থানায় হাজিরা দিতে হইবে। দারোগাকে টানিতে টানিতে একটী ঝোপের নিকট লইয়া আসিল, তাহার পর সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া রক্তাক্ত কাপড়ের একটী পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলির ভিতর যতটা পারিল শুকনা মাটি পুরিয়া দিল। ঘাটের নিকট গিয়া একটী বড় পুরাতন শালগ্রাম শিলা কুড়াইয়া লইল। সেটাকেও পুঁটুলির মধ্যে পুরিয়া সর্ব্বশক্তি দিয়া পুঁটুলিটী বাঁধিল। তাহার পর দুইতিন ধাপ জলের ভিতর নামিয়া যথাসম্ভব দূরে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর নিজ দেহের রক্তসিক্ত স্থানগুলি ভাল করিয়া

ধুইয়া ফেলিল কিন্তু কোট সম্পূর্ণ পরিষ্কার করিতে পারিল না—বস্ত্রের খাঁজে খাঁজে রক্ত জমিয়া গিয়াছে।

আকাশ ইতিমধ্যে আরও ঘোর হইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র জঙ্গলের বাহিরে যাইবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল দারোগার নিকট। দারোগার মাথাটা পিস্তলের গুলিতে উড়িয়া যাইলেও মুখটা গোটা আছে। পকেট হইতে একটা বৃহৎ দোভাঁজা শিকারী ছুরি বাহির করিয়া মুখটা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিল। এখন আর সনাক্ত করিবার কিছু নাই। মহেন্দ্র প্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতেছিল এমন সময় দেখিল দারোগার হাতে একটা পঞ্চধাতুর আঙ্গটী। মহেন্দ্র সেটা খুলিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পিঠের দিকে হাতটা উল্টান থাকায় অসুবিধা বোধ করিল। দেরি করিবারও উপায় নাই। মহেন্দ্র আঙ্গুলটাও কাটিয়া লইল। তখনও ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয় নাই। পুনরায রক্ত ধুইতে তাহাকে দীঘির দিকে যাইতে হইল। দীঘিব নিকটে আসিয়া অঙ্গুলির অর্দ্ধভাগ আঙ্গটী সুদ্ধ গভীর জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর ভাবিল যদি ভাসিয়া ওঠে কোন প্রকারে যদি কেহ…"না" বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিল,—অঙ্গুলিতে মাংস নাই বলিলেই চলে, হাড়ের ওজনেই তলাইয়া যাইবে। একান্তই যদি না যায় ত ভাসিয়া উঠিবার আগে যে কোন বড় মাছ খাইয়া ফেলিবে। মহেন্দ্র হাত ও ছুরি ধুইয়া উঠিয়া আসিল এবং সোজা জঙ্গলের বাহিরে যাইবার পথটা ধরিল। মহেন্দ্র সাবধানী মানুষ, গভীর জঙ্গলের ভিতরও সে এক পথে হাঁটে না, পায়ে চলা পথের দাগ হইয়া যাইবে বলিয়া। বিভিন্ন জন্তুর চলিবার পথ তাহার জানা আছে। সামনের গাছটাতেই ত বড় হরিণের গা ঘসার চিহ্ন রহিয়াছে,—গাছের ছালের কতক অংশ পালিশ হইয়া আছে। মহেন্দ্র হরিণের পথ ধরিল, অযথা মাথা নীচু করিয়া চলিতে হইবে না, কাঁটাগাছও কম পাওয়া যাইবে। কাঁটার ঘর্ষণ হরিণ পছন্দ করে না, শিং দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া লয়—এ পথে সামান্য ভয়ের কারণ যেটুকু আছে তাহা বড় বাঘের। ওরা পদচিহ্ন দেখে না, ঘ্রাণের দ্বারা শিকার খুঁজিয়া বাহির করে।

(৬)

ঝটিকা

মহেন্দ্র অগ্রসর হইতেছিল। চলিবার সময় হাতের যে দোলা সৃষ্টি হয় তাহাতে মহেন্দ্র প্রতিপদে বুঝিতে পারে চাবিটী যথাস্থানে রহিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর

হইতেই চাবির পরিচিত স্পর্শে কেমন নূতনতর অনুভূতি পাইল। চলা বন্ধ করিয়া কোমর বন্ধে হাত দিতেই বুঝিল সে ব্যস্ততা হেতু চাবির পরিবর্ত্তে অন্য কিছু তুলিয়া ফেলিয়াছে। যখন চাবি তুলিয়াছিল তখন দৃষ্টি তাহার দারোগার দিকে নিবদ্ধ ছিল, উত্তেজনার মাঝে সে একটা মোরগের পায়ের হাড় কুড়াইয়া লইয়াছিল। হাড়টা চোখের কাছে আনিয়া জোরে মাটির উপর আছ্ড়াইয়া ফেলিল। ঐ একটি মাত্র চাবি যাহার সাহায্যে সে সিন্দুকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া মাটির নীচে ধনাগারে ঢুকিতে পারে। ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ পথে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলির মানচিত্র সেই তীর চিহ্নিত কোটরের মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই মহেন্দ্র চাবির ছাঁচ্ করিয়া রাখিতে পারিত কিন্তু সাবধানতার মার নাই, সেই কারণে একটা চাবি লইয়াই সে সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চাবি মহেন্দ্র ফেলিয়া আসিয়াছে। সিন্দুকের নিকট কোন চাবির মিস্ত্রীকেও আনিবার উপায় নাই যে একটা নূতন চাবি তৈয়ারী করাইয়া লইবে। ইতিমধ্যে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ অনতিদূরে হরিণের আতঙ্কিত পদশব্দ পাওয়া গেল। হরিণের আর্ত্তনাদের সহিত গাছের ফাটল নির্গত বায়ুর আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। ঝড়ের জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। মহেন্দ্র চাবির জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। পুনরায় ফিরিল যেদিকে চাবি ফেলিয়া আসিয়াছে সেই দিকে। উত্তেজনা তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, উদ্‌ভ্রান্তের মত নানাদিক্ সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া সে একই স্থানে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। তাহার দিক্ ভুল হইয়াছে। যে গাছের তলায় সে চাবিটা ফেলিয়াছিল সেই স্থান হইতেই সে অন্যত্র খুঁজিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল।

ঝটিকা ইতিমধ্যে রাক্ষসের সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত বনানীকে আক্রমণ করিয়াছে। নিস্তব্ধ অরণ্য ধ্বংসবার্ত্তায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ শত কামান গর্জ্জনের শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া বজ্র দূরের তাল বৃক্ষে নিপতিত হইল। গাছটা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল। জঙ্গলে ঝড় ও অগ্নির একত্র সমাবেশে মহেন্দ্র নিজের অজ্ঞাতেই খানিকটা পিছাইয়া আসিয়াছিল। পদতলে ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থের স্পর্শানুভূতি পাইল, নীচু হইয়া পরীক্ষা করিতেই দেখিল চাবিটা তাহার পদতলেই পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ধূলিলুণ্ঠিত চাবি তুলিয়া নিজের জামায় পরিষ্কার করিয়া কোমরবন্ধের উপযুক্ত খাপে রাখিয়া দিল। পুনরায় বাহির করিয়া দেখিল এবার ভুল হয় নাই।

ঝড়ের বেগ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। যে দিক দিয়া ঝড় বহিতেছিল সেই দিক হইতে ধাবমান বড় হরিণের ক্ষুরধ্বনি ও আর্ত্তনাদ প্রায় স্পষ্ট হইয়া তাহারই

দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মহেন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া একটী গাছের আড়ালে হস্ত ও পদের উপর ভর করিয়া বসিয়া পড়িল। চক্ষের পলক না পড়িতে দেখিল বিরাটকায় স্বাস্থ্যবান নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া পালাইতেছে। সামান্য পিছনেই ভয়ঙ্কর শার্দ্দুল লম্ফের পর লম্ফ প্রদানে খাদ্য ও খাদকের মাঝে ব্যবধান কমাইয়া ফেলিতেছে। ক্ষণিকের মধ্যে হরিণ ও বাঘ অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, গুণ্ডা বরাহকে বিশ্বাস নাই। দূর হইতে শাদা কাপড় দেখিলে সে নিজেই পালাইয়া যাইতে পারে কিন্তু সামনা সামনি পড়িয়া গেলে রক্ষা নাই। সে হামাগুড়ি দিয়া পশুর মতই চলিতে লাগিল—যে পথে বাঘ হরিণকে তাড়া করিয়াছিল সেই পথে। নিশ্চিন্ত ছিল বাঘ তাহাকে না দেখিলে শিকার ছাড়িয়া আক্রমণ করিবে না। কোন প্রকারে আর খানিকটা অগ্রসর হইতে পারিলেই ফাঁকা মাঠে আসিয়া পড়া যায়। তখন অনেকটা নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। ঝড়ের বেগ সামান্য কমিয়াছে। মহেন্দ্র একটু মাথাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাঘের গর্জ্জন শুনিল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র একেবারে কুমীরের মত মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ একই অবস্থায় থাকিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। কয়েকটী পাতলা শুষ্ক ডালের টুকরা হাটুর চাপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার শব্দে বাঘ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণেই গর্জ্জন।

বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই পুনরায় ব্যাঘ্রের কণ্ঠ হইতে ঘর্ ঘর্ শব্দ শুনিতে পাইল। এবার সে ভীত হইল না কারণ শব্দটা রোষের নয়, আনন্দের। বাঘ নিশ্চিন্তভাবে উদর পূর্ণ করিতেছে আর সন্দেহ নাই।

মহেন্দ্র হামাগুড়ি দিয়াই চলিতেছিল, কিছুমাত্র অন্যমনস্ক হয় নাই, অদূরে দেখিল একটা নারিকেল গাছের ডগার দিকটা আড়ো ভাবে চলিবার পথে পড়িয়া আছে। একটু আগে যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে একটী নারিকেল গাছ সমূলে উৎপাটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়; সন্দিগ্ধ হইবার কিছু নাই। নিকটে আসিয়া দেখিল পতিত গাছটী নড়িতেছে এবং গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে। উহা একটী বিরাট অজগরের দেহাংশ, পাশের ঝোপে কিছুর সন্ধানে কিছুক্ষণ নিশ্চল অবস্থায় ছিল, সন্ধান নির্ভুল হওয়াতে ঝোপটার ভিতর ক্রমান্বয়ে ঢুকিয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের পাষাণবৎ হৃদয়ের স্পন্দনও স্তব্ধ হইয়া গেল। রাজায় রাজায় পরিচয়ের সূচনা চলিয়াছে। হরিণকে ধরিয়াছে বাঘ, বাঘকে ধরিতে চলিয়াছে প্রবল পরাক্রমশালী দৈত্য অজগর। মহেন্দ্র কাঠের মতই নিজের দেহকে প্রায় অসাড় করিয়া

রাখিল। মাটির উপর সামান্য শব্দই যথেষ্ট, কারণ সরিসৃপ কান অপেক্ষা বুক দিয়াই বেশী শুনিতে পায়, মহেন্দ্রের অস্তিত্বের সন্ধান পাইলে বাঘ ছাড়িয়া তাহাকে ধরিবে, গাছে উঠিয়াও নিস্তার নাই।

দৈত্যের দেহ সমস্তটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হইতেই মহেন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাঘ্র, বরাহ যে কেহ আসুক মহেন্দ্র আত্মরক্ষার জন্য একবার চেষ্টা করিতে পারিবে কিন্তু ময়াল সাক্ষাৎ যমরাজ—পা টিপিয়া, পা টিপিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল। জলসিক্ত শুকনা মাটির গন্ধ পাইতেই সে বুঝিল ফাঁকা মাঠের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, আর ভয় নাই ; দ্রুত পা চালাইয়া দিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই জঙ্গলের সীমান্তে আসিয়া পড়িল। নিরাপদ ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল কিন্তু সেই সময় দূরে একই সঙ্গে বহু গাছের ফাটল নিসৃত গোঙ্গানীর মত শব্দ শুনিতে পাইল। ঝড়ের আগমন সঙ্কেত ; ঈশান কোণে তাকাইল, সেইদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, দেখিল বহুদূরে পিঙ্গল বর্ণের ধূলা বিস্তৃত পরিধি লইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। বিপুল সৈন্যের বাহিনীর মত এক সারে তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল। মহেন্দ্রের চোখে নাকে তখন দুই একটা ধূলিকণা লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, মুখটা ঢাকিতে যাইবে এমন সময় দেখিল একটা আটচালার গোটা ছাউনি প্যাঁচে কাটিয়া যাওয়া ঘুড়ির মত টাল খাইয়া শূন্যে উড়িতেছে ; তাহার পর আর একটা মাটিতে ঠোক্কর খাইতে খাইতে উপরেরটার পিছনে ধাওয়া করিয়াছে। মাটিরটা টিনের ছাউনির খানিকটা অংশ। নিশ্চয় বল্টু ইত্যাদির সাহায্যে কড়া করিয়াই আটকান হইয়াছিল, বাতাস তাহা মানে নাই, অপর অংশ হইতে ছিঁড়িয়া উড়াইয়া আনিতেছে। টিনটা প্রায় মাটিতে আসিয়া পড়িয়াছে আর একমুহূর্ত পরেই হয়ত মহেন্দ্রের দেহটা খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া যাইবে। সে চক্ষু মুদ্রিত করিল, পরক্ষণেই টিনটা প্রচণ্ডবেগে একটা ছোট গাছকে আঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ কচুকাটার মত সম্পূর্ণ বৃক্ষটি কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে ধূলিকণা সূচের মত মুখে ও পায়ে বিঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ুর গতির বিপরীত দিকে মুখ না রাখিয়া উপায় নাই, টিনের মতই আর একটা কোন বস্তু ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে পারে। ঝড়ের বেগ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে। মহেন্দ্র নিজেই চালের ছাউনির মত উড়িয়া যাইতে পারে, উপর দেহের ওজন ঠিক রাখিতে পারিতেছে না—মহেন্দ্র আবার জঙ্গলের দিকে চলিতে লাগিল একটা মোটা গাছের গোড়া খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। ধূলা ঘন কুহেলিকার মত আড়াল সৃষ্টি করিয়াছে, কয়েকপদের বেশী কিছু দৃষ্টি গোচর হয়

না। হইলেই বা কি,—চক্ষু খুলিলে তবেই ত দৃষ্টির ব্যবহার করা সম্ভব হয়—চক্ষু খুলিবার উপায় নাই, অন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। মহেন্দ্র কতকটা অন্ধকারে হাতড়ানোর মত সামনে হাত দুইটী প্রসারিত করিয়া অরণ্যের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। এইবার সে আশ্রয় পাইয়াছে, প্রশস্ত গাছের গোড়া হাতে ঠেকিয়াছে। ঝড়ের গতির দিকে মুখ করিয়া গাছের গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইতেই মনে পড়িল ভীতিপ্রদ গাছের ফাটলগুলির কথা। কেউটে, গোখুরা, বড় চিতি এই সব স্থলে মিলিত হইলেই চরিত্র দোষ ঘটে। এই সময় কোন প্রকার অসুবিধা উহারা সহ্য করে না। অসুবিধার কারণকে সামনে পাইলেই দংশন করিয়া থাকে। চক্ষু খুলিয়া ফিরিয়া দেখিবারও উপায় নাই। হস্তদ্বারা স্পর্শানুভূতি আরো বিপদ জনক। অপরিচিত গতিশীল যে কোন বস্তু দেখুক না কেন তাহাকে বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠতা করাইয়া ছাড়িবে। তথাপি মহেন্দ্র গাছের কোন আশ্রয় ছাড়িল না। কতকটা নিশ্চিন্ত ভাবে আসিতেছিল কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। মহেন্দ্র দেখিতেছিল আশে পাশের ছোট ছোট গাছগুলি মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আবেষ্টনী বিকট শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বায়ুর অসম্ভব শক্তির নিকট পরাভূত না হইয়া কোন উদ্ভিদের যেন নিস্তার নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বিপদের আশঙ্কা দ্বিগুণ ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল। যে গাছটাকে আশ্রয় ভাবিয়াছিল তাহার অদৃশ্য দিকটীতে মূলগুলি ইতিমধ্যে যে মাটি হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছিল তাহা মহেন্দ্র জানিতে পারে নাই। গাছ তখন মহেন্দ্রের মাথার উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বাঁচিল একটা ধাবমান বরাহকে তাহার গা ঘেঁসিয়া ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া। ভাবিল বরাহ কখন একলা থাকে না;—গুণ্ডা পথ দেখাইয়া অপরদের পথানুসরণ করিবার ইঙ্গিত দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গাছের তলায় আশ্রয় লইল। প্রথম গাছটীর প্রাচীন শিকড় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অল্পক্ষণ পরেই ধরাশায়ী হইল মহেন্দ্রের চোখের সামনে। পড়িবার সময় চার পাঁচটী বরাহকেও চাপা দিল। শূকরের প্রাণ সাংঘাতিক কড়া। একে ঝড়ের শব্দ তাহার উপর শূকরের বিকট আর্ত্তনাদ। মহেন্দ্র মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—ভাবিল ঝড় থামুক বা না থামুক সে মাঠ পাড়ি দিবে। ইচ্ছা আসিলেই যেন অজ্ঞাত শক্তি তাহার সহায় হইয়া দাঁড়ায়।

মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। ঝড়ের কোপ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া মহেন্দ্র মাঠে নামিয়া পড়িল। মাটি ভিজিয়া নরম হইবার পূর্ব্বে জঙ্গল ছাড়িয়া তাহাকে খানিকটা যাইতেই হইবে। ভিজা মাটিতে

জঙ্গল হইতে গ্রামের দিকে পদচিহ্ন রাখিয়া যাওয়া দারোগা হত্যার পর চলে না। দুই একদিনের ভিতরই সরকার দারোগার অন্তর্ধানের হেতু বাহির করিবার জন্য মানুষধরাদের লেলাইয়া দিবে। তাহারই উপর যে প্রথম সন্দেহ আসিবে সে বিষয়ে মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত ছিল। মাঠে চলিবার সময় আর একটী সুবিধা পাইল, ঝড়ের গতি তাহারই গম্যস্থানের দিকে, বৃষ্টির ঝাপটা মুখে লাগিতেছে না এবং চলাটাও সহজ হইয়া গিয়াছে—বায়ু যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। মহেন্দ্র চলিতেছে, না দৌড়াইতেছে বলা শক্ত।

ফিরিবার সময় ঘোষ পাড়ার দিক ছাড়িয়া থানায় যাইবার জন্য একটা সোজা পথ বাহির করিয়াছে। এ পথে এবং এমনি সময়ে মহেন্দ্রই একলা চলিতে পারে। বল্লভপুরের কালীবাড়ীর শ্মশানঘাট পাশে রাখিয়া মহেন্দ্র দৃষ্টি সোজা রাখিয়া হাটিতেছে। ধ্বসে পরিণত বিরাট প্রাচীন মন্দিরের মাথাটা ঝড়ের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে কিন্তু টলিতেছে। মহেন্দ্র জানে উহার তলা দিয়া যাইলেও কোন ভয় নাই কারণ ঝড়ের সামান্য হাওয়াতেই উহা দোলে—বটের শিকড়েই দীর্ঘকাল হইতে উহাকে একই অবস্থায় আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। আসল গাথনির সহিত দোদুল্যমান অংশের কোন সম্বন্ধ নাই।

পান্থশালার পাশ দিয়া যাওয়া তাহার প্রয়োজন ছিল। এইখান হইতেই ত সে গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়াছে। সুড়ঙ্গের দ্বারা পথে নামিয়া ব্যাগ হইতে একটি নূতন ধরনের বৈদ্যুতিক মশাল বাহির করিয়া কল টিপিয়া দিল। দেখিল মাকড়সার জালটী বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে, মাটিতে চারাগাছগুলিও সহজ অবস্থায় বাঁচিয়া আছে। মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল।

থানা তখন বহুদূরে। মহেন্দ্রের ভিতরে অদ্ভুত চক্রান্ত খেলিয়া গেল। মন্দিরের চাতালের নিকট আসিয়া সজোরে নিজের মাথা পাথরের উপর ঠুকিয়া দিল। মহেন্দ্র নিজের মাথা ফাটাইয়া মন্দিরকে পিছনে রাখিয়া চলিতে লাগিল। রক্তে কাপড় কোট ভিজিয়া যাইতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই—সে চলিয়াছে থানার দিকে। বৃষ্টি ইতিমধ্যে একেবারে থামিয়া গিয়াছে।

(৭)

থানা

থানার বৃহৎ আটচালা, তাহারই সামনে রোয়াক্। ভিতরে নূতন দারোগাবাবু নাকের ডগায় চশমা লাগাইয়া বড় কেরোসিন আলোর তলায় কি লিখিতেছিলেন।

লেখার চাপে পুরাতন পায়া ভাঙ্গা টেবিলটা দুলিতেছিল। বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার তবু রোয়াকের হারিকেনের আলোতে বেশ খানিকটা দেখা যায় বাহিরের সান্ত্রি দেখিল একটী দীর্ঘকায় মানুষ বহুকষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে থানার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। পাহারা হাঁকিল—কে যার ?

মহেন্দ্র গুরুগম্ভীর গলায় উত্তর করিল, আমি। মহেন্দ্রের গলা এখানে সকলেই চেনে। দারোগা তখনও লিখিতেছিলেন। মহেন্দ্র নিকটে আসিতেই কন্‌স্টেব্‌ল দারোগাকে আড়াল দিয়া কায়দা দোরস্ত সেলাম ঠুকিল। দারোগার আদেশ ছিল মহেন্দ্র আসিলেই অন্ততঃ তিনজন কন্‌স্টেব্‌ল দারোগার সামনে এবং একজন ঠিক দারোগার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবে। মহেন্দ্রের হাজিরা দিবার কথা ছয়টা তিরিশের ভিতর, সে আসিল রাত্রি আটটা পনের মিনিটে। অন্য সিপাইগুলি রোটী পাকাইতে চলিয়া গিয়াছে সুতরাং তাহাদের এখন পাওয়াও মুস্কিল।

মহেন্দ্র রক্তমাখা মুখ লইয়া খোঁড়াইতে খাঁড়াইতে একেবারে দারোগার সামনে আসিয়া বলিল, নমস্কার দারোগাবাবু।

দারোগা মহেন্দ্র সম্বন্ধেই গরহাজিরা লিখিতেছিলেন। লেখাটী শেষ করিয়া গরহাজিরার বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখাইবার জন্য খুব হুকুমি কায়দার আলাদা ফরমে নোটিস্ লিখিতে যাইতেছিলেন, এমনি সময় মহেন্দ্র দারোগাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"নমস্কার দারোগাবাবু।"

দারোগা মহেন্দ্রের চেহারা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর চশমার উপর দিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইয়া আশেপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন, তিনি একেলা মহেন্দ্রের সামনে বসিয়া আছেন, তখন তাঁহার ত্রাস উপস্থিত হইল। অতি বিনীত ভাবে সামনের চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনি এত দেরি করে ফেললেন যে রিপোর্ট লেখা হয়ে গেছে। আপনার মাথাটা যে ভয়ানক কেটে গেছে, পায়েও লেগেছে দেখছি। কি হয়েছে বলুন ত। একেবারে ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গেছেন যে।

মহেন্দ্র বলিল,—ঝড়েতে একটা খিলান ভেঙে গিয়ে আমার বসবার জায়গাটায় ইঁটের টুকরো ছিটকে এসে একেবারে কপালের উপর পড়ল। পা-টাও জখম হয়ে গিয়েছে, উঠতে পারছিলাম না। বৃষ্টির মাঝেই বেরিয়ে পড়লাম, কোন প্রকারে এসেছি। পাঁচটার সময়েই বেরিয়ে ছিলাম, পা ভেঙ্গে পড়েছিলাম উঠতে পারিনি, সমস্ত বৃষ্টিটা মাথার উপর দিয়ে গেল। পরিষ্কার নেকড়া দিতে পারেন, বেঁধে ফেলি কাটাটা।

দারোগাবাবু কাঁচু-মাচু করিতে করিতে গর-হাজিরার কৈফিয়তের নোটিসের চিরকুটটা হাতের মুঠার মধ্যেই মুচড়াইয়া বাজে কাগজের চুব্‌ড়ীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কপালটা ধুইয়ে একটা নূতন ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিচ্ছি।

মহেন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—না, না, ব্যাণ্ডেজের জন্য ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের ছেঁড়া পরিষ্কার কাপড় হলেই চলবে। রক্তটা বেশী ঝরছে—ন্যাকড়াটা বড় হলেই ভাল হয়।

আচ্ছা দেখছি, বলিয়া ডাকিলেন, "দরোয়াজা"—দরোয়াজা খাড়া ছিল বটে কিন্তু, ভিতরে আসিল না। দারোগাবাবু নিজেই উঠিয়া তাহাকে বাহিরের পাহারা ছাড়িয়া ভিতরে আসিতে হুকুম করিলেন। মহেন্দ্র হাজিরা দিবার সময় হইতে সশস্ত্র পাহারার :ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে বেচারা কোণে ঠেসান দেওয়া বন্দুকটা তুলিয়া সঙ্গীন্ পরাইতে আরম্ভ করিল।

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি এমনি করে পাহারা দাও, বন্দুক একদিকে, সঙ্গীন একদিকে, অ্যাঁ? দাঁড়াও তোমার নামে আমি কালই রিপোর্ট করব।

কন্‌স্টেব্‌লও ছাড়িবার পাত্র নয়, উত্তর করিল তা রিপোর্ট কর। আমার নামে উপর আলা কৈফিয়তের চিঠি দিলে আমি বলব, আমার কি দোষ, দারোগার মুরগীর ডিম আনতে পোশাক খুলে যেতে হয়েছিল, ফিরে আসবার আগেই প্রিন্‌স্ সাহেব এসে পড়েছিলেন। সাক্ষী আছে লতিফা বিবি—পয়সা দিয়ে জিনিস কিনলে দেরি হয় না, মাঙ্গনায় বাছাই জিনিস পাওয়া কি সোজা কথা।

দারোগা—বেশ হয়েছে, এখন ভিতরে এস। কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন - দেখছ না চাঁদ, কে এসেছে।

কন্‌স্টেব্‌ল সবই জানিত। মহেন্দ্রের কর্ণগোচর করাইয়া উচ্চ গলায় বলিল,—সে ত হামি বুঝি, মগর ডর ত আম্‌রাভি আছে। এতটা বলিয়াই সে—জুড়িদার হো, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দারোগা তাহার মুখে হাত দিয়া বলিলেন,—করিস কি! আমরা ভয় পেয়েছি জানলে আর রক্ষে আছে।

কন্‌স্টেব্‌ল—আপনি কি বলছেন, হামি একলা ঐ দঙ্গল কি পালোয়ান কি সামনে খাড়া হইয়ে যাব?

দারোগা—হ্যাঁ, দঙ্গলের পালোয়ান না ছাই, ও দেখতেই ঐ রকম, তুমি এস, আমার সঙ্গে বন্দুক আছে কিসের জন্যে?

কন্‌স্টেব্‌ল—আরে হুজুর ময় তো যাইতে আছি, মগর জুড়িদারকে ভি

বোলাই তবে তো শের কা সামনে খাড়া হতে পারি। ওকি আদমি আছে. ওতো জীন্ আছে,—বন্দুক লেকে কি হোবে।

দারোগা—তোমার জুড়িদার আসবে ততক্ষণ আমি ঠায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকব? ভিতরে কাগজ পত্র সব—।

কন্‌স্টেব্‌ল—আরে হুজুর কাগজ্‌কা বাৎ তো হামি বুঝি, তা আপনি এতো ভাবছেন কেন? ভিতরে যান, আমি জোড়িদারকে পাকড়কে চলতে আছি। আরে হো ও—ও, জুড়িদার হো—ও। বলিয়া আবার কন্‌স্টেব্‌ল চীৎকার করিয়া উঠিল। দারোগাবাবু বিপদে পড়িয়া গেলেন। কন্‌স্টেব্‌লটী তাঁহার পেয়ারের মানুষ, বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া বিনা পয়সায় ডিম, দুধ, আরও কত কি সরবরাহের জন্য কন্‌স্টেব্‌লটার উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং কন্‌স্টেব্‌লও জানে দারোগাবাবু তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবেন না এবং দারোগাও জানে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। নিরুপায় হইয়াই দারোগা কন্‌স্টেব্‌লের জুড়িদারের জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন কারণ বন্দুকের টোটা তাঁহার ঘরের ভিতর বাক্সে বন্ধ। সুতরাং বন্দুক সঙ্গে থাকিলেও তাহাকে আশ্রয় ভাবিবার কিছু নাই। ওদিকে ঘরের ভিতর রিপোর্টের খাতাটাই মহেন্দ্রের সামনে খোলা ফেলিয়া আসিয়াছেন। লোকটা আবার রিপোর্টে নিজে হাতে কিছু না লিখিয়া দেয়। হ্যাঃ, দিলেই হইল কিনা। মনকে যে ভাবেই তিনি স্তোক দিবার চেষ্টা করুন আশঙ্কা গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। গত্যন্তর না থাকায় নিজেই একটু অগ্রসর হইয়া বন্ধ জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন সব ঠিক আছে কিনা।

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। যাহা ভাবিয়াছিলেন ঠিক তাহাই হইয়াছে। মহেন্দ্র ভিজা কাপড়েই চেয়ারে বসিয়া খাতাটা উল্টাইয়া রিপোর্টটা পড়িতেছে। ইত্যবসরে রোয়াকের কন্‌স্টেব্‌লটি জুড়িদার খুঁজিতে অন্ধকারে অন্তর্ধান হইয়াছে।

আটচালার ভিতরে মহেন্দ্র, বাহিরে দারোগা। কন্‌স্টেব্‌লের ব্যবহারে দারোগাবাবু দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন তাহার নামে একটী ভয়ানক কড়া রিপোর্ট করিবেন। কন্‌স্টেব্‌ল সম্বন্ধে সঙ্কল্প যাহাই করুন তিনি ঘরে ঢুকিলেন না।

মহেন্দ্র ইতিমধ্যে খাতাটীতে তাহার সম্বন্ধে যাহা রিপোর্ট লেখা হইয়াছিল তাহা পড়িল। লেখা আছে মহেন্দ্র অনুপস্থিত, ইহার কারণ জানিবার জন্য নোটিস্ জাহির করা হইতেছে। মহেন্দ্র নিজের নামে রিপোর্ট আবিষ্কার করা ছাড়া আর একটী রসাল খবর সংগ্রহ করিল। টেবিলের উপর কাঁচের ও গালার চুড়ির

কতকগুলি ভাঙ্গা টুকরা এবং টেবিলের কোণে দাঁত বার করা স্ক্রুর সহিত সংযুক্ত বেহারের দেহাতী মেয়েদের ছাপান মাড়যুক্ত কাপড়ের অংশ—যে মেয়েটী আসিয়াছিল তাহার উপর বোধহয় বল প্রয়োগ হইয়াছিল। মেয়েটী নিশ্চয় ডোম পাড়ার। এ কাপড় ডোম্‌নী ছাড়া আর কে পরিবে? কোন অসুবিধা ঘটায় দারোগাবাবু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং সেও তাড়াতাড়ি যাইবার সময় প্যাঁচ খাওয়া পেরেকের খোঁচে নূতন কাপড়ের টুক্‌রা রাখিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র চুড়ির টুকরাগুলি হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল। দারোগা জানালার ফাঁক হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া বাহিরে থাকিয়াই ছট্‌ফট করিতেছিল,—সব বেফাঁস হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ভাবিল, হাঃ, বেফাঁস হইলেই হইল, চুড়িগুলি যে অন্য রিপোর্টের প্রমাণের প্রদর্শনী নয় তা কে বলিল। হাজার হোক দারোগার বুদ্ধি, চালাকি করিবার উপায় আছে। আত্মতুষ্টিতে ভয়টা সামান্য কমিতেছিল কিন্তু পাহারাওয়ালারা তখন আসিয়া পৌছায় নাই। দারোগা অপর কন্‌স্টেব্‌লের বিরুদ্ধেও রিপোর্ট লিখিবেন ঠিক করিতেছিলেন এমন সময় দরোয়াজা জুড়ীদারকে সঙ্গে লইয়া আসিল। দারোগা তাহাকেও ধমক দিয়া বলিলেন,—তোমার নামেও রিপোর্ট লিখব। পরের লোকটী একটু উগ্র প্রকৃতির মানুষ, সকাল ও বিকালে কসরৎ করে; গলায় দুইটা নিরেট সোনার কাঠি আছে, এই কারণে অন্য পাহারাওয়ালারা তাহাকে খাতির করে। জমাদারের স্নেহও আসিয়া পড়িয়াছে কারণ কোন সময় জমাদার নিজে কসরৎ করিত।

আত্মাভিমানী নূতন লোকটী ধমকযুক্ত রিপোর্টের কথা শুনিয়া চটিয়া গেল। সেও রাগতভাবে উত্তর করিল,—হামার কি দোষ আছে হুজুর? আপহি তো আমাকে ডোমনী-কো বাড়ী পৌছানে কহা। হামি সাথমে নেহি যানে সে ডোম্‌নী কা খাস আভি থানেপর চড়াও হইয়ে যাবে, তারপর চিল্লাচিল্লি। উয়ো ডোমনী কি মরদ একদম নিমকহারাম। মুল্লুকমে এ খবর জানলে সে! আরে বাপরে বাপ, হামারা ইজ্জত চলা যাবে। হামি খাস্‌ মুঙ্গের কি ব্রাহ্মণ আছি—আউর্‌ হামি ডোমনী কি সাথে পেয়ার কোরছিল কই জানলে সে হামার জাত থাকবে?

দারোগা—খুব হয়েছে থাক; তোমার ইজ্জৎ আমার প্রাণের চেয়ে বড়, না? আর জোরে কথা বলতে হবে না, ঢের হয়েছে। ওর বাড়ী ত কাছেই, সেই কখন গিয়েছ, এত দেরি হল কেন?

নূতন কন্‌স্টেব্‌ল—আরে হুজুর হামি ঐ শা—নিমক হারাম কো দেখকে আস্‌লো, সব ঠিক আছে, কি নেহি, যে শা—এখোনোভি তাড়ি পিচ্ছে। হুজুর এ ভি ত হামার ডিউটি আছে—আপহি বোলিয়ে।

দারোগা—এখন এস ভিতরে এস। মুনিব যার সঙ্গে পেয়ার করে, উনিও তার সঙ্গে—। ভিতরে ঢুকিয়াই মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন। মহেন্দ্র ভাঙ্গা চুড়ির টুকরাগুলি দারোগাকে দেখাইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—ছেঁড়া ন্যাকড়া দেবার কথা বলেছিলেন—

দারোগা "হাঁ নিয়ে আসি" বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। মহেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পাত্র নয়। পেরেক হইতে ডোমনীর কাপড়ের ছিন্ন অংশটাও খুলিয়া লইল। দারোগা ফিরিয়া আসিলেন স্ত্রীর পরিত্যক্ত একটা প্রায় গোটা শাড়ী লইয়া।

মহেন্দ্র উহা হাতে লইয়া রোয়াকে উঠিয়া আসিল। পরিষ্কার অংশ বাহির করিবার অছিলায় ধোপার চিহ্নটা যে অংশে ছিল সেই স্থানটা পাড়সুদ্ধ ছিঁড়িয়া জলের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। একজন কন্‌স্টেব্‌ল জল আনিতে যাইতেছিল, দারোগা বাধা দিয়া বলিলেন—তুমি পারবে না, কোথা থেকে নোংরা জল নিয়ে আসবে তার চেয়ে আমি ঘর থেকে কুঁজর জল আনছি। হাজার হোক প্রিন্‌স্ মানুষ ত।

দারোগাবাবু মাত্র একজন কন্‌স্টেব্‌লের উপর নির্ভর করিয়া মহেন্দ্রের সাম্‌নে থাকাটা সুবিধাজনক মনে করিলেন না—সেই কারণে নিজেই জল আনার ভার লইলেন। জল আসিল। মহেন্দ্র কপাল ধুইয়া তাহার থানায় উপস্থিতির প্রমাণ ধোপার মার্কামারা কাপড়টা মাথায় বাঁধিয়া ফেলিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই বলিল—আপনার মেয়ে ত খুব বড় হয়ে উঠেছেন, তাছাড়া ঘোষপাড়ার গালার চুড়িও পরেন দেখছি, আজকাল কতরকমের ফ্যাশান উঠছে। শহুরে মেয়েরা সোনার চুড়ি ছেড়ে রেশমি কাঁচের চুড়ি পরতে আরম্ভ করেছে। তা হবে, আপনার মেয়ে কলকাতায় লেখাপড়া করেন বুঝি?

চুড়ির টুকরা হাতে থাকাতেই দারোগাবাবু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, তাহার উপর কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া যে সব প্রশ্নমালা মহেন্দ্র গাঁথিতে আরম্ভ করিল তাহা থানায় হাজিরদারের শোভা পায় না। মনে মনে ভাবিলেন, আর বাড়াবাড়ি করিলে রিপোর্ট করিয়া দিবেন। দারোগাবাবু মহেন্দ্রের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একটু আদেশের সুরেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার এত দেরি হল কেন? আমি ত রিপোর্ট লিখে ফেলেছি,—এখন আর বদলাই কেমন ক'রে! রিপোর্ট খাতায় কাটাকুটি করলে আবার সই করতে হয়, তার উপর আবার কৈফিয়ৎ আছে।

বলার ভঙ্গিতে সামান্য উগ্র ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া দারোগা

চকিতে পার্শ্বে ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন কনস্টেব্‌ল দুইটা ঠিক ঠিক দাঁড়াইয়া আছে কিনা ; তাহার পর ভাবিলেন ঘরে যখন ঢুকিয়াছিলেন তখন টোটাগুলি লইয়া আসিলেই পারিতেন। অন্যমনস্কতা ক্ষমা করিতে পারিলেন না—সম্ভব হইলে নিজের বিরুদ্ধেই রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিতেন।

মহেন্দ্র বলিল,—সে কি দারোগাবাবু! আমি জলজ্যান্ত আপনার সাম্‌নে বসে আছি আর আপনি লিখে দিলেন গর হাজির। আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ হয়ে এই কথাটা উচ্চারণ করলেন কেমন করে? আপনি মিথ্যা রিপোর্ট লেখেন একথা শুনলে লোকে বল্‌বে কি? লোকে জানে আপনার মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে আর কেউ নেই।

কুক্কুটের মাংস ভক্ষণে দক্ষতা লাভ করিয়াও যে ব্রাহ্মণ জাতিগত ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য আদর্শ পুরুষ হিসাবে জনসাধারণের নিকট পরিচিত সে মানুষ চাটূক্তিতে একটু গলিয়া যায় বৈকি। দারোগাবাবু রক্তমাংসের শরীর লইয়া জন্মাইয়াছেন সুতরাং মহেন্দ্রের নিকট হুকুমের পরিবর্ত্তে যে সমাদর পাইলেন তাহা তুচ্ছ ভাবিবার বস্তু নহে। প্রীত হইয়া বলিলেন,—তাহ'লে এখন কি করতে বলেন?

মহেন্দ্র—লিখে দিন আমি ঠিক সময়ে হাজিরা দিয়েছি।

দারোগা—সে কি, ঠিক সময় কেমন ক'রে হল, আপনি ত এলেন রাত আট্‌টা পনেরোয়।

মহেন্দ্র—ঝড় আর বৃষ্টি থামল সাতটা কুড়িতে, আমার পা ভাঙ্গল, মাথা ফাট্‌ল খিলান পড়ে গিয়ে—তারপর পথে শুনলাম্ আপনি এদিকে ব্যস্ত ছিলেন, আগে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই নি।

দারোগা—আমি ব্যস্ত ছিলাম? কই না ত।

মহেন্দ্র—তা ছিলেন বৈকি। এই ভাঙ্গা চুড়ি আর এই কাপড়ের টুক্‌রাই ত যথেষ্ট প্রমাণ,—তাছাড়া পরের কনস্টব্‌ল যা বল্‌ল সবই শুনলাম তো।

দারোগা—সে কি, আপনি আবার কি শুনলেন!

মহেন্দ্র—রোয়াকে আপনারা কথা বলছিলেন, আমি জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই সব শুন্‌তে পেলাম্।

দারোগা—আপনি জানালার কাছে এসে দাঁড়াতে গেলেন কেন? আপনাকে ত বসার জন্য চেয়ার দিয়েছিলাম্।

মহেন্দ্র—আপনার চেয়ার কীটে পূর্ণ তাই ওদের অভ্যর্থনা থেকে রেহাই পাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। উঠে দাঁড়াতেই আপনাদের বচসা শুন্‌তে

পেলাম্। ভাবলাম্ আপনার উপর কেউ বল প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছে। আমি বেঁচে থাকৃতে-তা হতে দিই কেমন করে।

দারোগা—তাহলে আপনি ডোম্নির কথা...

মহেন্দ্র—আজ্ঞে সব শুনেছি।

দারোগা—তা আপনি সমস্তই যখন শুনেছেন তখন ত সবই বুঝতে পারছেন।

মহেন্দ্র—বেশ পারছি। হাজিরার সময়টা ঠিক ক'রে দিন, আমি ত' পাঁচটা থেকেই এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম,—ঝড় বাদল আর খিলান ফাটার উপর তো কারও হাত নেই। এতটা বলিয়া আবার একটী ভগ্ন চুড়ি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল। দারোগা পরীক্ষার বস্তুটি দেখিলেন এবং ইহাও বুঝিলেন পরীক্ষার মীমাংসা কতটা জটিল হইতে পারে। প্রত্যক্ষ না হইলেও মনে মনে কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন,—তাহ'লে কি করতে হবে ?

মহেন্দ্র—আপনি কি না করতে পারেন, আপনি হলেন এ গ্রামের স্বয়ং হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। দারোগা কখনো মহেন্দ্রের নিকট এত সুন্দর ভাষা শুনে নাই, বেশ নরম হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু নরম হইলেই ত হয় না, পুরা গরহাজিরাকে পাঁচটায় হাজিরা লেখা যায় কেমন করিয়া ? দারোগা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। খোদ লাট সাহেবের পাশে বসিয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে যে মানুষ রাত্রি ভোজনের নিমন্ত্রণ পায় সে ত বড় চারটিখানি কথা নয়। স্বয়ং সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবও সেখানে পাত পায় না। দারোগাবাবু প্রায় গলিতেছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে আসিল খাতা দেখিতে ত লাট সাহেব আসেন না সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টই আসিয়া থাকে, তখনই তিনি আবার কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বসিলেন, বলিলেন,—সে কি হয় প্রিনস্ সাহেব। মহেন্দ্র এ বিষয়ে প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে একটি বোতল বাহির করিল। অভ্যন্তরস্থিত বস্তুটি তরল, পান করিলে তাহার রং অন্তরকেও রঙ্গীন করিয়া তোলে। বোতলটী দারোগাকে দেখাইয়া বলিল,—একটু হবে নাকি ? ও বেটারা বেহারী আমাদের কথা কিছু বুঝবে না। দারোগাবাবুর পান-দোষ ঘটিয়াছিল প্রায় বাল্যকাল হইতে, অভ্যাসটা ধেনো ও তাড়িতে। মাঝে মাঝে বিলাতী মদ পাইয়া গিলিয়াছেন বটে, সে কচিৎ। রসিককে বোতলের তরলটী আকর্ষণ করে ভিন্ন ভাবে। অর্থাৎ যে আকৃষ্ট হয় অধিকাংশ স্থলে মদই তাহাকে খাইয়া বসে। দারোগা বোতল দেখিয়াই বেশ তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু পাশেই কন্‌স্টেব্‌ল থাকায় মনোভাবের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পাইল না। মহেন্দ্র যেন অন্তর্যামী, হাসিয়া বলিল,—ওদের যেতে বলে দিন না।

দারোগার কি সে ইচ্ছা আসে নাই, ভাবিল বলে, তুমি প্রিন্‌স্ মহেন্দ্র হইয়াই তো সব মাটি করিয়াছ, অমন মালের মোহেই যদি ফেলিলে তো তুমি মহেন্দ্র হইয়া আসিলে কেন ! একদিকে দুর্দ্দান্ত লোভ অপর দিকে ভয়ের জীবন্ত মূর্ত্তি। ভয়টা কাটাইতে পারিলেই·· সুস্বাদু বিলাতি সুরাটা দারোগা আবার আড়চোখে দেখিল। তাহারই হুকুম মত লোক দুইটা ঠিক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মহেন্দ্রকেও দেখিয়া লইল—কই সেরকম চড়া ধরনের মানুষ বলিয়া মনে হইতেছে না তো। দারোগাবাবু আজ একটু আগে হইতেই তাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন—গোলমালে পুরা মাল খাওয়া হয় নাই। আগুন ধরাইয়াছিলেন ধোঁয়াও উঠিয়াছিল কিন্তু উত্তাপটা কাজে লাগে নাই। প্রায় নির্ব্বাপিত আগুনকে ফুৎকার দ্বারা বাড়াইয়া তুলিবার নিমিত্ত মহেন্দ্র নলটা সামনে ধরিয়া বসিয়া আছে। বোতলস্থিত তরলের আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

দারোগা—আমি ও সব খাই না, তবে আপনি যখন বলছেন তখন···কিন্তু এদের সামনে কেমন ক'রে সম্ভব হয়।

মহেন্দ্র জানিত ইচ্ছাটা কড়া করিয়া তুলিতে পারিলেই সাক্ষীর কোন অসুবিধা হইবে না কিন্তু তাহার নিজের উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় বিঘ্ন আসিতে পারে। মহেন্দ্র চার ফেলিল। অতি বিনীত ভাবে একটা কাচের গেলাস চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি না খান আমাকে অন্ততঃ অনুমতি দিন, একে মাথার বেদনা তার উপর বৃষ্টিতে ভিজেছি—গা'টা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

দারোগা—তা কোটটা খুলে ফেলুন না, আমার জামা ত' আপনার গায়ে লাগবে না,—একটা চাদর দিচ্ছি গায়ে দিন। ওষুধ হিসাবে একটু খেলে দোষ কি আছে, আমি চাদরটা নিয়ে আসি।

দারোগা উঠিয়া যাইতেই ছিপি খুলিতে গিয়া খানিকটা ব্র্যান্ডি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। বাহিরের লোক ঘটনাটি দেখিলে বলিত অসাবধানতা কিন্তু মহেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই ঘটনাটী ঘটাইয়া ছিল। চারের উগ্র ঘ্রাণ না থাকিলে শিকার টোপ গিলিতে আসিবে কেন ?

একটী প্রমাণ ধোপ দোরস্ত শাড়ী লইয়া দারোগা ফিরিয়া আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—এঃ, খানিকটা ফেলে দিয়েছেন বুঝি ? ইস্ দামি মদ—অনেকটা পড়ে গেছে। চাদর পেলাম না, কাল ধোপার বাড়ির কাপড় এসেছে—আমার স্ত্রীর শাড়ীটাই গায়ে দিন।

মহেন্দ্র বুঝিল চারের গন্ধ কাজে আসিয়াছে—তবে আরো কাজে আসা দরকার। দারোগা বাবু শুধু শাড়ী লইয়া আসেন নাই, সঙ্গে গেলাসটাও ছিল।

তাঁহার হাত হইতে গেলাস লইয়া অর্দ্ধেকটা নিটব্র্যাণ্ডি নিজের জন্য ঢালিয়া লইল। তাহার পর এক চুমুকে অনেকটা শেষ করিয়া ফেলিল। দারোগা লোলুপ দৃষ্টিতে পাত্র ও পানীয়ের দিকে তাকাইয়াছিল। মহেন্দ্রের কীর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, বলিল, করছেন কি? অত কড়া মদ জল না মিশিয়ে অতটা এ্যাঁ,—ইস্ মারা যাবেন যে।

মহেন্দ্র—চেষ্টা করলে আপনিও পারবেন। মজাতো নিটেই। জল মিশিয়ে খেলে যখন মৌজ এসে পৌছায় তখন উদর এমন ভাবেই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে পরে সামান্য চাট্ খাবারও জায়গা থাকে না। একটু খেয়ে দেখুন না।

দারোগা—খুব মজা লাগে নাকি? তা আপনি যখন অত ক'রে বলছেন—তা একটু দিন।

দারোগা রামদীনকে গেলাস্ আনিতে হুকুম করিলেন। ঘর হইতে একটী পাহারাওয়ালা খসিল।

মহেন্দ্র আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল,—মাথাটী ফাটাইয়া সে বিশেষ বুদ্ধির কাজ করিয়াছিল। মাথা না ফাটাইলে এতটা দরদ নিংড়াইয়া বাহির করা যাইত না। তাছাড়া পুরাতন দারোগার রক্ত কোটের অনেক অংশে লাগিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে সব জায়গা পরিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। নিজের দেহে ক্ষত না থাকিলে কোটে রক্ত দেখিয়া প্রথমেই ত মহাপুরুষ সন্দেহ জড়িত প্রশ্ন করিয়া বসিত। তাহার পর রক্ত পরীক্ষার জন্য কোটটী চাহিয়া বসিলে অবিলম্বে প্রমাণ হইয়া যাইত রক্ত মানুষের। মহেন্দ্রের নিজের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই অথচ তৃতীয় ব্যক্তির রক্ত বহন করিয়া বেড়াইতেছে প্রমাণ হইলেই সন্দেহের কারণ গাঢ় হইয়া উঠিত। এখন সে যদি কোটটী দারোগার এখানে ছাড়িয়াও যায় তাহা হইলেও কোন ভয়ের কারণ নাই, কারণ হয় কোটটী কাল কেহ কাচিয়া দিবে অথবা রক্ত শুকাইয়া গেলে কিছুকাল পরে পুরাতন দারোগা ও তাহার রক্ত একাকার হইয়া যাইবে। মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে কোটটী খুলিয়া দিল।

দারোগা নিজ হস্তে জামাটী লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ খুঁজিয়া পাইল না। যে কনস্টেব্‌লটী দারোগার জন্য গেলাস আনিতে গিয়াছিল সে আর ফিরিল না। দারোগা আটচালার পিছনে গিয়া মহেন্দ্রের কোট তাহার হাতে দিয়া কি একটী চিরকুট লিখিয়া দিলেন। কোট লইয়া কনস্টেব্‌ল সাইকেলে উঠিয়া পড়িল।

এবার যে কনস্টেব্‌ল দারোগার পিছনে আসিল তাহাকে দেখিলেই মনে হয় দ্বিপদযুক্ত একটী পাঁঠা।

কর্ত্তব্য শেষ করিয়া দারোগা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন,—দিন একটু খাই, বাদলাটা জমেছে ভাল। মহেন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার গেলাসে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

দারোগা—জল না মিশিয়ে খাব?

মহেন্দ্র – খান না, মজা ত ওতেই।

উভয়ে চুমুকের উপর চুমুক চালাইতে লাগিল। অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র চটিয়া বলিল,—আপনারা আমাকে এত ভয় করেন কেন বলুন ত?—দুটো লোক সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে এ জিনিস জমে?

দারোগার উপর "নিটের" ক্রিয়া সহজেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মনটাও ছিল প্রফুল্ল, কারণ মহেন্দ্রের কোট্‌টা সদর থানায় অত সহজে পাঠাইতে পারিবেন ভাবেন নাই। ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি প্রমাণ হইয়া যায় রক্ত একজনের নয় তাহা হইলে ত "কেল্লা ফতে"! কলিকাতা হইতে বিশেষ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়া দিবে। মহেন্দ্র সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিলে একটা যা হোক কিছু বাহির হইয়া পড়িবে। তার রক্ত পরীক্ষার ফলে যদি তাহার সন্দেহ ভুল বলিয়াই প্রমাণ হয় তাহা হইলেও লাভ বই লোকসান নাই কারণ সন্দেহ করাটাও তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে একটা। বড় কর্ত্তাদের সুনজরে আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

দারোগার গেলাস খালি হইয়া আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহার অনুমতি না লইয়াই আর খানিকটা ঢালিয়া দিল। ইতিমধ্যে আবার ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

দারোগা সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে, নেশার মধ্যে তাড়ি ও বিড়ি খাওয়া অভ্যাস, নিট্‌ ব্রাণ্ডি ভিতরে ঢুকিয়া সব গোলমেলে করিয়া দিয়াছিল। ব্র্যাণ্ডির সহিত সম্বন্ধ নিকট হইবার পূর্ব্বে যে প্রথায় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছিলেন, সম্বন্ধ নিকট হইবার পরে মনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। দারোগা উচ্ছ্বসিত ভাবে টেবিলে চড় মারিয়া বলিল,—ও শা—কে আমি কত টাকা দিয়েছি জান বন্ধু, তবু মেয়েটা শাদা কাপড় পরে আসবে না। বলে কিনা সাদা কাপড় পরলে ওর মরদ্‌ সন্দেহ করবে। আজ এসেছিল জান না? তার চুড়িই ত তুমি ঘাঁটছিলে। যাক্‌—বেশ জমে উঠেছিল এমন সময় রসিক পরামাণিক্‌ একেবারেই রোয়াকের উপর এসে হাজির। নালিশ হ'ল কি জান? তার বৌ তাকে ঝাঁটাপেটা করেছে। রসিককে দেখেই মেয়েটা আমাকে ছেড়ে পাশের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। আমি হাতটা চেপে ধরেছিলাম কিন্তু ঐ রকম জোয়ান মেয়েকে

সামলান যায় ? সে হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। মাঝখান থেকে তার চুড়িগুলো ভাঙ্গল।

মহেন্দ্র বুঝিল তাহার ব্র্যাণ্ডি সধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া আবার দারোগাকে অনুরোধ করিল, কনস্টেব্‌ল দুইটীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে। মদ উপযুক্ত ভাবে মদ্যপায়ীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে ভয়ের কারণগুলি আপনা হইতে তিরোহিত হইয়া যায় ইহা মহেন্দ্রের নিকট অজানা ছিল না। সুবিধা অনুসন্ধানী প্রিন্‌স বলিল,—আপনি নিশ্চয় আমাকে ভয়ানক ভয় করেন, তা না হলে দুই তিন জন লোক সামনে না থাকলে কাছে আসতে দেন না কেন ?

ভয়ের কথা উঠিতেই দারোগা সজোরে টেবিলে চাপড় মারিয়া বলিল,—কি, যতবড় মুখ না ততবড় কথা, আমি ভয় করি তোমাকে! দরোয়াজা তোমরা বাহির মে যাও। আমি প্রিন্‌স্‌কা সাথে একলা কথা বলতে চাই, একেবারে একলা, বুঝলে ?

ঠায় দাঁড়াইয়া থাকা হইতে রেহাই পাইয়া কনস্টেব্‌লরা বাঁচিয়া গেল এবং অবাকও হইল। কোন রকম প্রশ্ন না করিয়া উভয়েই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্র কাল বিলম্ব না করিয়া বলিল—আমি এলাম পাঁচটায় আর আপনি আমাকে গব হাজির করে দিলেন।

দারোগা অনেক আগেই সম্বোধনটা "তুমি" তে নামাইয়া আনিয়াছিল, বলিল,—কি তুমি গরহাজির, আমার দোস্ত গরহাজির,—হতেই পারে না। লে আও খাতা। খাতাটী সামনেই ছিল। মহেন্দ্র গেলাস বাঁচাইয়া পুস্তকটি দারোগার সামনে ধরিল। দারোগা রিপোর্ট কাটিয়া লিখিল, প্রিন্‌স্ মহেন্দ্র হাজির পাঁচটা পনেরোয়।

মহেন্দ্র উঠিয়া দেখিল সবই ঠিক হইয়াছে কেবল কাটার জায়গায় দারোগা নাম সই করে নাই। এই ত্রুটি তাঁহার নজরে আনিবার জন্য বলিল,—কি দারোগাবাবু, এতদিন পরে এতবড় ভুল করলেন, কেটে লিখলেন আর নাম সই করলেন না ?

দারোগা—তাই নাকি—এঁ্যা, আমি ভুল করেছি ? কই দেখি বলিয়া আবার কাটিতে যাইতেছিলেন। মহেন্দ্র হাত চাপিয়া ধরিল, তাহার পর অতি নরম ভাষায় কানের কাছে আসিয়া বলিল,—আমি ডোম্‌নীর চেয়ে ভাল জিনিসের খবর রাখি। দারোগা মহেন্দ্রের মুখ এবং অপর হাতটা দেখিয়া লইলেন তাহার পর রিপোর্টের দুই কোণায় দুইটী সই করিয়া দিলেন।

এত সহজে কাজ হাসিল হইবে মহেন্দ্র ভাবিতে পারে নাই। দারোগার গেলাসে আর খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল, উঠি রাত হোয়ে গেল। উঠি বলিয়াই মহেন্দ্রের খট্‌কা লাগিল—যে কন্‌স্টেব্‌ল কোট লইয়া গিয়াছিল সে ত ফিরিল না। তাহার পর ভাবিল হয়ত কোথাও গিয়া থাকিবে, তাহার দুশ্চিন্তা অমূলক। দারোগা কোট লইয়া পরীক্ষায় পাঠাইবে? পাঠাইলেই বা ক্ষতি কিসের আছে? রক্ত মানুষেরই বাহির হইবে। হইলেই বা তাহাতে ভয়ের কারণ কি আছে? দারোগা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহার মাথা দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, তাঁহারই স্ত্রীর মার্কামারা শাড়ী দিয়া ক্ষতস্থানটা বাঁধা হইয়াছে! এ কাপড় ত তাহার কাছেই থাকিবে। তাছাড়া হাজিরা পাঁচটা পনেরোয়! এতগুলি প্রমাণ সহায় থাকিতে তাহার অধিক মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করার কোন অর্থ হয় না। তথাপি কোটটা বেহাত হওয়াতে নরঘাতক নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না, ভাবিল কোথাও নিশ্চয় গলদ থাকিয়া গিয়াছে।

কূট চিন্তার ঘূর্ণমান চক্র নির্দ্দিষ্টগতি হইয়া চলে না। আশঙ্কা ও সন্দেহই তাহার যাত্রাপথের পাথেয়। মহেন্দ্র ভাবিল যদি পরীক্ষায় রক্ত দুইটা মানুষের প্রমাণ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রথম দারোগার অন্তর্ধানের সহিত তাহার কোটের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবাটা কর্ত্তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। মহেন্দ্র প্রায় নিজমূর্ত্তি ধরিতে যাইতেছিল কিন্তু মনোভাব সংযত না করিয়া পারিল না কারণ বিপদ আসিবার পথ সে নিজেই আরো সোজা করিয়া দিবে। রক্ত দুইটা মানুষের প্রমাণ হইলেই দারোগার রক্তের সহিত তুলনা করিবার জন্য যথা সময়ে বৈজ্ঞানিকদের নিকট কোটটা গিয়া উপস্থিত হইবে। হাসপাতালে নিশ্চয় পুরাতন দারোগার রক্তের রেকর্ড আছে কারণ মহেন্দ্র জানিত দারোগা বহুদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিল। ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কত রোগের বীজাণু থাকিতে পারে যাহার সহিত কোটের রক্ত ও দারোগার রক্তে অমিল আসিয়া পড়িতে পারে। মহেন্দ্র কঠোর হইয়া উঠিতেছিল,—এই আধমরা দারোগাটা নিশ্চয় তাহাকে ঠকাইয়াছে। মহেন্দ্র মাতালের ভঙ্গিতে জড়িত ভাষায় বলিল,—তা হুজুর আমার কোটটা দিন বাড়ী যাই, রাত হয়ে গেল।

দারোগার কথাও তখন জড়াইয়া গিয়াছে,—আরে বস না দাদা। তোমার কোট? সেটা যে ধোপার বাড়ী পাঠালাম। রাতারাতি কোটটা ধোপার বাড়ী পাঠান হইল কেন মহেন্দ্র উপলব্ধি করিল। মহেন্দ্র ভাবিল এখন বোকা না সাজিলে উপায় নাই। ভাষাটা অধিকতর জড়িত করিয়া বলিল,—দারোগা সাহেব আজ তাহলে উঠি, একটু বেশী খাওয়া হয়ে গেছে, পা-টাও জখম,

তার ওপর জ্বরভাব লাগছে। ডিম যোগানদার কনস্টেব্‌লটাকে সঙ্গে দেবেন বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে? থানায় হোঁচট খেলে সেইখানেই পড়ে থাকতে হবে।

দারোগা ভাবিল মহেন্দ্রের প্রার্থনা দৈব প্রেরিত। কনস্টেব্‌ল দেখিয়া আসিবে মহেন্দ্র সত্যই বাড়ী ঢুকিয়াছে কিনা। সামান্য অসুবিধার অজুহাত তুলিয়া কনস্টেব্‌লকে মহেন্দ্রের সহিত যাইতে আদেশ করিলেন এবং ইহাও মহেন্দ্রকে শুনাইয়া দিল, আলো দিবার অসুবিধা আছে। পা-টা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এইরূপ ভাণ করিয়া মহেন্দ্র কোন প্রকারে উঠিল এবং বোতলটা ইচ্ছা করিয়াই টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। দারোগা যতই চালাক হউক সামনে বোতলটা থাকিলে হুঁস্ না হওয়া পর্য্যন্ত সুরার ব্যবহার চলিবে। বেশী মাত্রায় খাইলে রাত্রির বহু ঘটনাই ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মহেন্দ্র খোঁড়াইতে, খোঁড়াইতে, কোন প্রকারে টাল সাম্‌লাইয়া হাঁটিতেছিল। থানার এলাকা ছাড়িয়া অনেকটা দূর আসার পর মহেন্দ্র সোজা হইয়া চলিতে লাগিল। আদেশের স্বরে প্রথমেই মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—কোট নিয়ে লোকটা কোথায় গেল?

কনস্টেব্‌ল—হুজুর, সদর থানায়।

মহেন্দ্র শুধু "হুঁ" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর গম্ভীর গলায় বলিল, আমার হুকুম মনে আছে?

কনস্টেব্‌ল—হাঁ হুজুর।

মহেন্দ্র—যখনই খবর পাবে তখনই চাকরি ছেড়ে দিতে পারবে?

কনস্টেব্‌ল—হাঁ হুজুর।

মহেন্দ্র এক তোড়া দশ টাকার নোট কনস্টেব্‌লের হাতে গুঁজিয়া দিল। তাহার পর নিজের আদেশ ও তাহার পালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য বলিল,—দশ হাজার টাকা বকশিস, হাজার টাকা দিয়েছি, বাকি টাকা কাজ হাসিল হলে পাবে। আর কোনরকম গোলমাল করলে তোমাকে নিজের মাথার ওজন বইতে হবে না, বুঝলে?

কনস্টেব্‌ল—হুজুর।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে রামগড়ের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্র বলিল,—এখন যাও, ভোর চারটের সময় সব খবর চাই।

—যো হুকুম হুজুর, বলিয়া কনস্টেব্‌ল থানার দিকে ফিরিল।

(৮)

গুপ্ত ধন

রামগড়ের ছোট্ট ঘরটীতে তখনও আলো জ্বলিতেছে। থানার দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। গভীর রজনী, অন্ধকার ও নিশুতির আতঙ্কপূর্ণ নিস্তব্ধতা চতুষ্পার্শে সমবেষ্টিত। মাঝে মাঝে দুই একটী ভেকের ডাক আশু বৃষ্টির সম্ভাবনার সঙ্কেত দিতেছে। মহেন্দ্র অস্ত্র সজ্জিত ঘরে একেলা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

মহেন্দ্র দুশ্চিন্তার মহা সমুদ্রে ভাসিয়া চলিয়াছে। সমুদ্রের মাঝখান হইতে কূল দেখা যায় না। সে জানিত ডুবিতে হইবে তথাপি যতক্ষণ আয়ু আছে ততক্ষণ কোন প্রকারে ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে চিন্তাস্রোত তাহাকে এমন একটী স্থানে লইয়া তুলিল যেখানে তরঙ্গ আছ্ড়াইয়া এক মুহূর্ত্তে মারে না, কিছুকালের জন্য আশ্রয় দিয়া জোয়ারের সহিত মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষার সময় দেয়, তিলে তিলে বাঁচিয়া মরিবার জন্য।

ক্ষণিকের আশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্র জীবনের পুরাতন ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে দেখিতেছিল চলচ্ছবির মত। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে প্রৌঢ়ত্বের উপলব্ধি পর্য্যন্ত। একটীর পর একটী ঘটনা তাহার সামনে দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

প্রথমে যখন রাজকুমার কলেজে ঢুকিল তখন তাহার অসাধারণ শক্তি ও মেধার পরিচয় পাইয়া সাহেব গুরু বলিয়াছিলেন,—মহেন্দ্র, তোমার ভবিষ্যৎ তুমি এমন ভাবেই গড়িয়া তুলিবে যে দেশের মানুষ তোমার কীর্ত্তির নিকট মাথা নত না করিয়া পারিবে না। তুমি বড় কাজের জন্য জন্মাইয়াছ, বড় কাজের জন্যই বাঁচিবে। মহেন্দ্র ভাবিতেছিল গুরুর ভবিষ্যবাণী সার্থক হইয়াছে ভিন্নরূপে। তাহার কীর্ত্তির কথা ভাবিয়া সকলেই মাথা নত করে। সে মানুষের কাছে আজ জীবন্ত বিভীষিকা। নরঘাতক হইয়া ফাঁসির হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। ধরা-পড়া এবং বিচারের সময়টুকু মাত্র তাহার জীবনের বাকি অংশ।

পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়া যখন সে দেশে ফিরিল তখন সে পিতৃমাতৃ হীন। এটর্ণি জানাইল, পিতা উইল করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া মহেন্দ্র প্রথমেই এটর্ণির সহিত সাক্ষাৎ করিল। এটর্ণি একটী খাম ও মহেন্দ্রের নামে

একটী চেকবই দিলেন। মহেন্দ্র কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ব্যাঙ্কে কিছু আছে ? এটর্ণি উত্তর করিয়াছিলেন,—আপনার উপযুক্ত কিছু নেই তবে লাখবারো আছে, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত থাকিতে পারিলে আপনার জীবন কেটে যাওয়া উচিত। আমার নিজের ফি ছাড়া উদ্বৃত্ত নগদ হাজার খানেক আমার কাছে আছে, আপনাকে এখুনি দিচ্ছি।

এটর্ণি অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে মহেন্দ্র খাম খুলিল। পিতা নিজ হস্তে লিখিয়াছেন। প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছেন—আমাদের আথিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের পুরান গহনা ও অন্যান্য দামী বস্তু অধিকাংশ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাকি দুই একটী পুরাতন গহনা এখন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। এই পত্রের সহিত ছাড়পত্র দিলাম। ব্যাঙ্কের কর্ত্তাদের দেখাইলেই ফিরত পাইবে। তোমার মাতার পান্নার সাতনরী ও আমার হীরকের আঙ্গটী ভিন্ন আর কিছু রক্ষা করিতে পারি নাই। যদি পার গহনা দুইটাকে হাত ছাড়া করিও না এবং একান্ত যদি বিক্রয় করিতে হয় ত কোন মার্কিন দেশীয় ধনীর নিকট চেষ্টা করিও, এ দেশে সহজে কেহ উপযুক্ত মূল্য দিবে না। সাতনরীর দাম তের লাখের কম হওয়া উচিত নয়। আঙ্গটী লাখ খানেক হইতে পারে। এটর্ণির নিকট সামান্য টাকা থাকিবে। আমার উইলে সবই তোমাকে দিয়া গিয়াছি, যদি পার পালদীঘির জঙ্গল হইতে আয়ের ব্যবস্থা করিও। রামগড় আমাদের পুরাতন প্রাসাদ, সম্ভব হইলে সেইখানেই বাস করিও। কামনা করি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। ইতি। তোমার পিতা -

শ্রীযোগেন্দ্র পাল।

কলেজের শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মহেন্দ্র যৌবনের নূতন উদ্দামতায় ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ গৃহস্থের চালে সে কখন থাকে নাই। কলিকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় উঠিয়া প্রথম কিছুদিন হিসাব করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সন্ধ্যায় সুরার উত্তেজনায় পুরাতন দিল্ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। "লে আও" বলিলেই তড়িতে হুকুম তামিল করিবার জন্য সব স্তরের কর্ম্মচারিরা তটস্থ হইয়া থাকিত। সাহেবী পার্টি ও শ্যাম্পেনের বন্যায় নগদ টাকা নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল। এইরকম আরও কত ঘটনা একটীর পর একটী মহেন্দ্র আহ্বান করিয়া আনিতেছিল তাহার বিশদ বর্ণনার সময় এখন নাই। সংক্ষেপে সে কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থের মত জীবন যাপন করিতে পারিল না। মহেন্দ্র প্রিন্সই থাকিয়া গেল।

মহেন্দ্র যে ভাবে চলিতেছিল তাহাতে নগদ বারো লাখ ত দূরের কথা বৎসরে

উক্ত আয় থাকিলেও যথেষ্ট হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই নগদ যা পাইয়াছিল তাহা প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

মহেন্দ্র খরচ সম্বন্ধে একটা পুরা সপ্তাহ অত্যন্ত কড়া হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় দেশী বিদেশী জহুরীদের নিকট সাতনরী ও আঙ্গটী বিক্রয়ের আবেদন চলিতে লাগিল। সাহেব দোকানদারেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দাম দিতে চাহিল এবং যে দাম নির্দ্ধারিত হইল তাহা ন্যায্য দামের চতুর্থাংশও নয় তদুপরি ব্যাঙ্কে যাইবার জন্য যাতায়াতের ভাড়াটাও কাটিয়া লইল। মহেন্দ্র কিছুদিন হইতে সাবধানেই চলিতেছিল কিন্তু তাহার প্রকৃতি যাহারা জানিত তাহারা সকলেই বুঝিয়াছিল এই সাবধানতার উপর হঠাৎ কোন দিন সে সাংঘাতিক ভাবে প্রতিশোধ লইয়া বসিবে। ঘটিলও তাহাই। কিছুকাল পরেই মহেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল। এখানেও বেশীদিন থাকা সম্ভব হইল না। সামান্য একটী ছোট বাড়ী লইয়া মহেন্দ্র শহরের অখ্যাত স্থানে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল।

যখন সে নিজের চালে চলিতেছিল তখন অনেক রাজা-মহারাজা তাহার নিকট প্রয়োজন না থাকিলেও আসিতেন, হুল্লোড় করিতেন, নানাভাবে তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু মহেন্দ্রের অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহারা তাহার সহিত যোগ রাখিতে পারিলেন না নিজেদের পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে। যাহারা টিকিয়া গেল তাহারা টিকিয়াই থাকে শকুনীর মত মৃতের শেষ মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার জন্য।

এখন প্রাচুর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাব আসিয়া পড়িয়াছে। নিঃস্বতা মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতায় থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। মহেন্দ্র আসিল রামগড়ে বাস করিতে। পরিত্যক্ত প্রাসাদ যে অবস্থায় পড়িয়াছিল সেইভাবেই থাকিয়া গেল মেরামত অভাবে। প্রাসাদের অন্তিম কোণে পূর্ব্ববর্ণিত ঘরটিতে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া মহেন্দ্র বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল।

এখানে আসার পর সে সব অভ্যাসই ছাড়িয়াছিল কেবল কোঁচান মিহি ধুতি, সুরা ও মাঝে মাঝে শিকারের নেশা ছাড়িতে পারে নাই। নিজের জঙ্গলে শিকার করিতে বাহির হইত একলা। মদ খাইত সঙ্গীহীন অবস্থায়। মহেন্দ্রের ইংরাজী ভাষায় যে ধরনের দখল ছিল তাহাতে যে কোন মহারাজা উপাধিধারী জমিদারের নিকট মোটা মাহিনার সেক্রেটারির পদ পাইতে পারিত সে। সরকারী বৃত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিলে আবেদন করিলেই সফল হইত। কিন্তু মহেন্দ্র কোনটাই করিল না। হুকুম মানা তাহার পোষায় না, তা' ছাড়া

জমিদারের তুলনায় তাহার সম্মান অনেক উপরে। সরকারী বৃত্তি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও একজন সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন পত্র পাঠাইতে তাহার আত্মগরিমা সায় দেয় নাই। নূতন বাঁচিবার ধারায় মহেন্দ্রের প্রথমটা ভালই লাগিতেছিল, প্রধান কারণ অর্থহীন ভদ্রতার অভিসম্পাতে প্রপীড়িত হইবার কোনো অবকাশ ছিল না। গ্রামের সহজ জীবন যাত্রায় সে নূতনত্বের রূপ দেখিয়াছিল। মেয়েদের কর্মপটুতা, তাহাদের সুস্থ দেহ এবং অস্বাভাবিক আকর্ষণ বর্জ্জিত চলিবার ভঙ্গি মহেন্দ্রকে অনেক সময় মুগ্ধ করিয়া ফেলিত।

যৎসামান্য অর্থ কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রামগড়ে বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছিল সে। সেইটুকুর ব্যবহারেই গ্রামের লোক তাহাকে মহাধনী ভাবিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচয়ের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হইতেছিল, মহেন্দ্র প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই ইহার কারণ কি! যখন বুঝিল তখন অর্থব্যয় সম্বন্ধে আরও কড়া হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—অভ্যাস তাহার পুরাতন, এখন স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র অবশেষে মানুষ বাছিতে আরম্ভ করিল। দাদাবাবু, কাকাবাবু সম্বন্ধ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। গ্রাম ভাল লাগিলেও গ্রাম্য আচরণে সে অভ্যস্ত নয়। অনেককে "হুজুর" বলিয়া সম্বোধন করিতে শিখাইল। যাহারা হুজুর সম্বোধনের সহিত আনুষঙ্গিক আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল তাহারা টিকিয়া গেল। বাকি মানুষগুলিকে মহেন্দ্র বকশিস দিয়া বিদায় করিল।

মহেন্দ্র এখন অনেকটা ধাতস্থ হইয়া আসিয়াছে। সঙ্গী বলিতে কেহ নাই। তাহার শখের পুস্তকগুলিও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে! এখন শিকারই তাহার সময় কাটাইবার অবলম্বন। শহরে থাকিতে রাজা-মহারাজারা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া জঙ্গলে লইয়া যাইতেন কিন্তু মৃগয়ায় তাঁহাদের স্ত্রীসুলভ আচরণ দেখিয়া মহেন্দ্র ব্যথিত হইত। মহেন্দ্র যে ভাবে মৃগয়ায় বাহির হইতে চায় তাহার সুযোগ সে পাইয়াছে।

বৎসর না কাটিতে মহেন্দ্রের ছোট্ট ঘরটি ব্যাঘ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অনেক হিংস্র জন্তুর চামড়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেদিন মহেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল গতকল্যের আহত শার্দ্দুলের জীবনলীলা শেষ করিবার জন্য। জঙ্গলের অতি নিকটেই বল্লভপুরের মাঠ ও কালী বাড়ীর রাস্তা পড়ে। পুরাতন ধ্বংসপ্রায় স্থাপত্যের একটী লোম-হর্ষক আকর্ষণ আছে যাহা মহেন্দ্র ভালবাসে। কালীবাড়ী ও বল্লভপুরের মাঠ তাহার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত, পাল দীঘি জঙ্গলের চৌহদ্দির ভিতর পড়ে। মহেন্দ্র

মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, শিকারে আর যাওয়া হইল না। এইরূপ আচরণ মহেন্দ্রের কখনও দেখা যায় নাই। মন্দিরে ঢুকিবার পূর্ব্বে ভাবিল বাঘটা আজ গুলি না খাইলে কাল সে আপনা হইতেই মরিয়া থাকিবে। না যদি মরে ত বুকে গুলি খাইয়া যে বাঘ বাঁচিতে পারে তাহাকে বাঁচিতে দেওয়া উচিত। মন্দিরের চারিপাশে ঘুরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অদ্ভুত দরজা, আর অদ্ভুত স্থাপত্যের গঠন প্রণালী। দুই তিনবার মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়াছে তথাপি তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হয় নাই।

মহেন্দ্র নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি পিতলের মোটা শিকল পদতলে আবিষ্কার করিল। অনুসন্ধিৎসা ও দুঃসাহসিকতার যেখানে যোগাযোগ ঘটে সেখানে পরীক্ষার সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। টান মারিতেই ধাতুনির্ম্মিত কোন ভারি ফাঁপা বস্তুর সহিত যোগ আছে বলিয়া মনে হইল। পরীক্ষক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। মহেন্দ্র শিকলের গোড়া খুঁজিয়া বাহির করিল। যুক্ত স্থানটি লৌহ দ্বারের একটী অংশ বলিয়া মনে হইল। যে স্বাভাবিক শক্তি লইয়া মহেন্দ্র জন্মাইয়াছিল তাহাই যে কোন দেশের সাধারণ মানুষের সহিত অতুলনীয় তদুপরি রাজকুমার কলেজে পরম নিষ্ঠার সহিত নানাপ্রথায় মল্লযুদ্ধ অভ্যাস করায় তাহা আতঙ্ক ও শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া আছে। নিকটে আসিয়া প্রাণপণ শক্তির সহিত শিকল টানিল, দেখিল সমকোণের আকার লইয়া তিন দিকে স্থানে স্থানে মাটির চাপ্‌ড়া সহ ঘাস ছিঁড়িয়া যাইতেছে। যাহা ভাবিয়াছিল ঠিক তাহাই—শিকল নিশ্চয় কোন বৃহৎ প্রোথিত সিন্দুকের সহিত সংযুক্ত। যে যে স্থলে ঘাসের চাপ্‌ড়া উঠিয়া পড়িয়াছিল সেই স্থানগুলি শিকারের ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিল। সামান্য চেষ্টাতেই ঘাসের চাপ্‌ড়াগুলি উঠিয়া আসিতে লাগিল কারণ তাহার শিকড় লৌহের নিকট আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একদিকে খানিকটা পরিষ্কার হইতেই কারুকার্য্য খচিত ইস্পাতের কব্জা বাহির হইয়া পড়িল। চৈনিক শিল্পীর স্পর্শের স্পষ্ট ছাপ তখনও রহিয়াছে। দ্বারের অন্যস্থানে মরিচা পড়িয়া কোণাগুলি এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো হইয়া গিয়াছে কিন্তু কব্জা প্রায় আসল আকৃতি লইয়া টিকিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া মহেন্দ্র তাহার বিপুল শক্তি শিকলের উপর প্রয়োগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অতি উৎকট গন্ধের সহিত তাহার দুই তিন হাত তফাতের ভিতর একটি লৌহ কবাট খুলিয়া গেল। নিকটে আসিয়া দেখিল উহা সিন্দুক নহে, একটি গুপ্ত দ্বার। দুইজন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি চলিতে পারে এমনি একটি সিঁড়ি ভূগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটী ধাপের পর ঘোরতর অন্ধকার। কাছে আসিলেই গন্ধ আরও উৎকট হইয়া উঠিতেছে, তথাপি

মহেন্দ্র মাটিতে বসিয়া সিঁড়ির প্রথম কয়েকটী ধাপ পরীক্ষা করিল। ধাপগুলি লাল পাথরের, তাহার উপরে বৃষ্টি ধৌত মাটি পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তর্জ্জনীর দ্বারা অনুভব করিল মাটি শুকাইয়া কঠিন পাথরের মত হইয়া গিয়াছে। নিজের অঙ্গুলির পাশেই দেখিল একটী বৃহৎ জানোয়ারের পদচিহ্ন। আরও নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করিতেই বাহির হইয়া পড়িল চিহ্নটি বহুকাল পূর্ব্বের এবং বাঘের থাবার। বাঘ নীচু হইতে উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, উপর হইতে নীচে নামে নাই।

মাটির গহ্বর হইতে বাঘ উপরে উঠিল কেমন করিয়া মহেন্দ্র অনুমান করিতে পারিতেছিল না এবং দ্বার বন্ধ থাকিলে উপরে উঠিলই বা কেমন করিয়া? জন্তুটীকে উপরে উঠিবার জন্য নিশ্চয় কেহ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। মানুষ না হইলে শিকল টানিবে কে? এবং যে শিকল টানিয়াছিল সে তাহারই মত জোয়ান মানুষ এবং নিশ্চয় বাঘ তাহার পোষা। পোষা না হইলে উপরে উঠিয়া আসিয়া মানুষকে সামনে পাইলে নিশ্চয় তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। তদুপরি এখানে পালাইয়া লুকাইবার স্থানও তো কোথাও নাই। সব কয়টী ঘরই কবাটহীন। আবিষ্কারটি চিন্তার বিষয়—কত বৎসর আগে জন্তুটি পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে নিশ্চিত জানিবার উপায় না থাকিলেও উহা যে বহু পুরাতন সে বিষয়ে শিকারী মহেন্দ্রের সন্দেহ রহিল না, কারণ পদচিহ্নের খাড়াই পাড ওঠার মত দাগগুলি অতি মিহিভাবে ক্ষইয়া গিয়াছে। পদচিহ্নের মধ্যস্থলে যৎসামান্য শ্যাওলাও জন্মাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল—দ্বারটী খুলিল কে। মানুষের পদচিহ্ন উপরে দেখা যায় না কারণ সমস্ত স্থানটী ঘন ঘাসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র একটা পাথরের টুকরা নিকটে আনিয়া বসিল। সময় ছুটিয়া চলিয়াছে, সেদিকে মহেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই। পলে পলে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় স্থানটি আবছায়ার ভিতর ডুবিতেছিল। মহেন্দ্র একই স্থানে বসিয়া ভাবিতেছিল কে দ্বার খুলিয়াছিল। কোন সম্ভব কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। কাল সকালেই আসিবে ভাবিয়া পুনরায় দ্বারটী বন্ধ করিতে যাইতেছিল এমন সময় ভূগর্ভের বহুদূরে কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইল। শব্দটী ভিতরে বহুস্থানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল! প্রতিধ্বনি হইতে মহেন্দ্র অনুমান করিল মাটির তলায় নিশ্চয় বৃহৎ ফাঁপা জায়গা আছে। দ্বার যদি বন্ধ থাকিল তো বাঘ ঢুকিল কোন দিক দিয়া। তবে কি এখানে কেহ বাঘ পুষিয়াছে। এখানে বাঘ পুষিবার কি কারণ থাকিতে পারে। বাঘই যদি হয় কাল সকালে আসিয়া পরীক্ষা করা যাইবে। এইবার

মহেন্দ্র বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই উঠিল। শিকল টানিয়া লৌহদ্বার প্রায় বন্ধ করিতেছিল এমন সময় আবার সেই গর্জ্জন বেশ নিকট হইতে শুনা গেল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার স্তিমিত রশ্মিটুকুও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। গাঢ় অন্ধকার আবেষ্টনীকে আক্রমণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। মহেন্দ্র বিলাতী বৈদ্যুতিক মশাল কিঞ্চিৎ দূরে ফেলিয়া দেখিল ঠিক আছে। ক্ষিপ্র গতিতে লৌহদ্বারের নিকট হইতে অনতিদূরে একটী অশ্বত্থের গোড়ায় ভরা রাইফেল লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। একলা শিকার করায় মহেন্দ্র বহুদিন হইতে অভ্যস্ত, সুতরাং কিছুমাত্র ভীত না হইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিল ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য। ইহা নূতন ধরণের শিকার হইবে—বাঘ সিঁড়ি বহিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। মহেন্দ্র ভীত হওয়া দূরের কথা প্রায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। গর্জ্জন এবার ক্ষণে ক্ষণে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আসিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মত শিকারীর অন্তরেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। এ গর্জ্জন তো শিকারান্বেষণের নয়,—এ যে রাজকুলপতির প্রেম নিবেদন। প্রেয়সীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তবে কি ভূগর্ভে উহারা বসবাস করিয়া থাকে? অসম্ভব। নিশ্বাস লইবে কেমন করিয়া? যদি নিঃশ্বাস লইবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে গহ্বরের ভিতর অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে,—হয়তো অসাধারণ মানুষের অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মহেন্দ্র এইবার সাবধানতা অবলম্বন করিল। লৌহদ্বারের দিকে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে পিছাইতে আরম্ভ করিল। ইটের স্তূপের উপর যথাসম্ভব দেহের সমতা রাখিয়া চলিতেছিল। মন্দিরের চাতালে বাম হস্ত ঠেকিতেই মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল, সে মন্দিরের চাতাল স্পর্শ করিয়াছে। কোন প্রকারে মন্দিরের ভিতর ঢুকিলে সে রাইফেল লইয়া নিরাপদ হইতে পারে। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্য লইলে এই সামান্য দূরত্বে তাহার লক্ষ্য বিফল হইতে পারে না। মহেন্দ্র বিষধরের আনুমানিক উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া আড়ালে ঢুকিয়া পড়িল।

এমনি একটী সময় ও আবেষ্টনীর মাঝে পড়িলে সাধারণ মানুষ ভয়ে বিহ্বল হইয়া যাইত। মহেন্দ্র আপন মনে হাসিয়া ফেলিল। বাঘ তাহাকে খুব ভাল করিয়া দেখিয়া আক্রমণ করিলেও তাহার দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। বটের শিকড় এমন নিবিড় ভাবেই মাটি ও পাথরকে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে প্রথম লম্ফে একেবারে তাহার সামনে আসিয়া পড়িলেও ক্ষতি নাই। মহেন্দ্র পকেট হইতে রূপার সামরিক ফ্লাস্ক বাহির করিয়া খানিকটা ব্রাণ্ডি খাইয়া ফেলিল, তাহার পর সিগারেট ধরাইল। পুরা গিসারেটটী শেষ হইয়া গেল, বাঘের আর সাড়া

নাই। গুপ্ত দ্বার হইতে যতটা দূরে সে আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থান হইতে পুনরায় উহার নিকট যাওয়া বিপদসঙ্কুল কার্য্য। ইতিমধ্যে বাঘ যদি উপরে উঠিয়া আসে তাহা হইলে প্রথমেই তাহাকে দেখিবে। যদি কোন প্রকারে গুলি না লাগে এবং এক গুলিতে হত না হয় তাহা হইলে মল্লযুদ্ধ ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু মানুষের দৈহিক শক্তি লইয়া বাঘের সহিত লড়াই চলে না।

মহেন্দ্র আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর কিছু ব্রাণ্ডি খাইয়া ফেলিল। বোধ হয় এক সঙ্গে একটু বেশী খাইয়া ফেলিয়াছিল। একে মহেন্দ্রের সাহস তাহার উপর ব্রাণ্ডির উত্তেজনা, উভয়ের মিলনে মহেন্দ্র স্থির থাকিতে পারিল না। রাইফেল অটোমেটিক হইলে কোন ভাবনা ছিল না—মাত্র দো-নলা। জঙ্গলের আহত বাঘকে মারিবার জন্য দোনলাই যথেষ্ট ভাবিয়াছিল,—মাঝপথে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। মহেন্দ্র উঠিয়া আসিল। খোলা দ্বারের সামনে আসিয়া বসিল। কোন সাড়া নাই। তবে কি বাঘের গর্জ্জন ভৌতিক কাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট নাকি? হউক না। অশরীরীদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনিয়াছে,—চাক্ষুষ দর্শনের যখন সুযোগ পাইয়াছে তখন ছাড়ে কেন।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় উৎকট চাম্‌সে গন্ধে মাথাটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। পুরাতন বাড়ীতে একই স্থানে বহু বাদুড় বহুদিন ধরিয়া বসবাস করিলে যেরূপ গন্ধটা ঝাঁঝাল হইয়া উঠে সেইরূপ। মাটির তলায় যাহাই থাকুক তাহা বিস্তৃত, ইহার ভিতর ঢুকিবার অন্য পথ আছে—যেখান হইতে বাদুড় ঢুকিতে পারিয়াছে। প্রথমবার যেখান হইতে বাঘের গর্জ্জন শুনিয়াছিল তাহার দূরত্ব দুই মাইলের কম হইবে না—তার মনে হইল শব্দটি জঙ্গলের দিক হইতে আসিয়াছিল। চিন্তার সমাধান জটিল হইয়া উঠিতেছিল। অসীম সাহসী ও বলবান মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া যাইবে ঠিক করিল—পরক্ষণেই ভাবিল আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক্। দোটানার মাঝে পড়িয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এমন সময়ে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অতি নিকটে শুনিতে পাইল। কালবিলম্ব না করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া বন্দুকের নলটী দ্বারপথের উপর রাখিয়া নিজে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ঘাসের উপর বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরার কোণাগুলি বুকে দারুণ ভাবে বিঁধিতেছিল। একটী কাঁকড়া বিছাও বোধ হয় জানুর কাছে হুল ফুটাইয়া দিল, মহেন্দ্র নড়িল না। এক মুহূর্ত্ত পরেই একটী বিরাট থাবা সিঁড়ির উপর ধাপে দেখিতে পাইল। তাহার পরেই মাথাটা বাহির হইয়া আসিল। চক্ষের পলকে গুলিও ছুটিয়া গেল। বাঘের মাথার অনেকটা অংশ কানের উপর হইতে উড়িয়া গিয়াছে। হুঙ্কারের পালা শেষ হইয়া গেল।

মহেন্দ্র উঠিয়া খানিকটা দূরে গিয়া টর্চের সাহায্যে টিপ করিয়া হৃদয়টাও উড়াইয়া দিল। পরমুহূর্ত্তে রাইফেলে নূতন টোটা ভরিয়া ফেলিল। টর্চ বাঘের উপর পড়িতে দেখিল তাহার চোখ জ্বলিতেছে না। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া জন্তুটাকে টানিয়া গহ্বর হইতে বাহির করিল। পাঁচ মণের কম ওজন হইবে না। মহেন্দ্র একলাই কোন প্রকারে তাহাকে মন্দির চাতালের তলায় রাখিয়া দিল এবং ফিরিয়া আসিয়া লৌহ দ্বারটী পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিল।

পরের দিন ভোর না হইতেই মহেন্দ্র কালী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শিকারী প্রথমে আসিয়াই গতরাত্রের হত বাঘ দেখিল। ঠিক্ আছে। মহেন্দ্রের এ কি পরিবর্ত্তন, চামড়া কাটিবার জন্য একটী মানুষকেও সঙ্গে আনে নাই। মৃত জন্তুটীকে ছাড়িয়া সোজা কবাটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শিকলটী যথাস্থানে পড়িয়া আছে। পূর্ব্ববৎ শিকলের ব্যবহারে কবাটটী খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই চাম্‌সে গন্ধসহ ভিতর হইতে হাওয়া বহিতে লাগিল। তুলার সহিত কি ঔষধ মিশাইয়া তাহা নাসারন্ধ্রে পুরিয়া দিল, তাহার পর নাক এবং মুখ উভয়ই কাপড় দ্বারা মাথার পিছনের সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। খুব সম্ভবতঃ দূষিত বায়ুর বিষাক্ত প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছিল।

মহেন্দ্র এইবার নূতন থাবার চিহ্নের সহিত পুরাতনের তুলনা করিল। সে কিছুমাত্র ভুল করে নাই, আগের থাবাটি বহু পুরাতন। বামহস্তে টর্চ এবং দক্ষিণ হস্তে পিস্তল লইয়া সিঁড়ির অনেকগুলি ধাপ নীচে নামিয়া গেল। মহেন্দ্রের আর মাথা দেখা যাইতেছে না। অল্পক্ষণ পরে আবার উঠিয়া আসিল। চতুষ্পার্শে তাকাইয়া দেখিল তখন ফর্সা হইতে দেরি আছে। উপরে আসিয়া মাটির দিকে টর্চের আলো ফেলিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল যেন কিছু খুঁজিতেছে। যাহার সন্ধানে ঘুরিতেছিল তাহা পাইল, একটি বৃহৎ পাথরের চাঁই,—স্থাপত্যের কোন ভগ্নাংশ হইবে। সর্ব্বশক্তি দিয়া ঠেলিতে তাহা সামান্য নড়িল কিন্তু গড়াইল না। মহেন্দ্রের শক্তিতে যাহা সম্ভব হইল না, তাহা পাঁচজন মানুষ একত্রে চেষ্টা করিলেও পারিবে না। এইবার সে একটি সাবলের মত কোন লৌহ দণ্ড খুঁজিতে আরম্ভ করিল। টর্চের সাহায্যে সর্ব্বত্র দেখিল, লোহার চিহ্নমাত্র কোথাও পাওয়া গেল না। মৃত বাঘের নিকট একটি অতি দামী অটোমেটিক রাইফেল রাখিয়া আসিয়াছিল, মহেন্দ্রের দৃষ্টি পড়িল সেইদিকে। চিন্তা ও কার্য্যে মহেন্দ্রের চরিত্রে অতি নিকট সম্বন্ধ, একবার গহ্বরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফিরিল রাইফেলের

দিকে। রাইফেলটি তাহার আদরের অস্ত্র। নলের উপর হাত বুলাইয়া যেন ছোট শিশুকে আদর করিতেছে। পরক্ষণেই চেম্বার হইতে টোটাগুলি বাহির করিয়া সজোরে পাথরের উপর বাঁট ঠুকিতেই কাঠের অংশটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। এইবার শুধু বন্দুকের নলটি লইয়া পাথরের তলায় চাড়া মারিতে আরম্ভ করিল। পাথর গড়াইল এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা লৌহ কবাটের উপর না উঠিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহেন্দ্র নিরস্ত হইল না। পাথরকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার পর বন্দুকের নলটি তুলিয়া দেখিল মুখ ফাটিয়া গিয়াছে, গঠনও ঈষৎ বাঁকিয়াছে। ঈষৎই অব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট। মহেন্দ্র রাইফেলের নলটি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

এখন সে ভূগর্ভের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কোন শব্দ নাই। কিছুক্ষণ একই স্থানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ একটি আওয়াজ আসিল,—গুরু গম্ভীর গলায় কে যেন বলিতেছে—ভূউ উৎ, ভূউ উৎ। শব্দ অনুসরণ করিয়া শব্দকারীকে আবিষ্কার করিল,—নিশাচর ভূতুমপেঁচা। মহেন্দ্র প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। টোন্ সূতার বাণ্ডিলে দুই পকেট ভর্ত্তি। একটি বাহির করিয়া বাহিরের পাথরের সহিত একটি প্রান্ত বাঁধিল, অপরটি নিজের নিকট রাখিয়া ভিতরে নামিতে আরম্ভ করিল। প্রথমটা অন্ধকার লাগিয়াছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বুঝিল ভিতর হইতে আলো আসিতেছে—স্পষ্ট না হইলেও সব কিছু দেখা যায়। মহেন্দ্র টর্চের ব্যবহার প্রয়োজন বোধ করিল না। খানিকটা নামার পর সমতল জমি পাইল পাথর বাঁধান, কোণ হইতে কৃত্রিম আলো আসিতে-ছিল। আলো যে পথ দিয়া ঢুকিয়াছে সেই পথ দিয়া বাতাসও বহিতেছে। মহেন্দ্র একটু দাঁড়াইতে অনুমান করিল একটি বিরাট হলের মাঝে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। টর্চ জ্বালিলে তীব্র আলোতে একটি বিশেষ স্থান লক্ষ্য করা চলিবে কিন্তু কোথা হইতে আলো আসিতেছে বাহির করা সম্ভব হইবে না। কারণ টর্চের আলোয় চোখ ঝল্সাইয়া যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। উপরে নিশ্চয় ভোর হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেই কারণেই বোধ হয় ঘরের ভিতর আলোও বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রথমেই আবিষ্কার করিল তাহার সাম্নে একটি বেদির মত উচ্চ পাথরবাঁধানো মঞ্চ, তাহার উপর একটি ভগ্ন সিংহাসনের মত কি রহিয়াছে। নিকটে আসিল—সিংহাসনই বটে এবং ধাতুর তৈয়ারী। কোন্ ধাতুর বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্চ হইতে সামান্য দূরে মেজেতে একটি সরল রেখার ফাটল বরাবর দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত স্থাপত্য, মনে হয় যন্ত্রের সাহায্যে ঘরটিকে ইচ্ছা করিলেই কোন সময়ে

বিভক্ত করা চলিত। নিকটে মেঝের ফাটলের ভিতর টর্চের আলো প্রবেশ করাইয়া দিল। ঘন কুয়াশার ভিতর আলো জ্বালিলে যেমন সামান্য পরিধির পর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ টর্চের আলো যতটা চলিয়া গেল ততটাই গহ্বর আবিষ্কৃত হইল।

মেঝেতে আর কিছু নাই—স্তূপীকৃত ভাবে ধূলো জমিয়াছে—শুক্‌না ময়দার মত। মহেন্দ্র ফিরিল অন্য পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। ঘরটা অতি বৃহৎ, হয়ত দরবার ইত্যাদির জন্য উহা কোন সময় ব্যবহৃত হইত। দেয়ালে হাত দিয়া অনুভব করিল উহা পাথরের নয় অত্যন্ত মসৃণ কিছুর। দেয়াল পরীক্ষা করিবার সময় এখন নাই, সে পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেই অনুভব করিল ঐদিক দিয়া হাওয়া আসিতেছে। মহেন্দ্রের চলা থামে নাই। সে পথ পাইল,—উঁচু সিঁড়ির ধাপ, উপর ধাপে হাত দিয়া ধরিয়া নীচের ধাপের পা তুলিতে হয়। সে উঠিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই হয় সিঁড়ি, না হয় দক্ষিণে অথবা বামে রাস্তা মোড় ফিরিয়া যাইতেছে,—আবার সমতল জমি। যেখানে আসিয়া সিঁড়িটা শেষ হইল তাহা তিনটা পথের সঙ্গম স্থল। কোন্ দিকে যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না, ঠিক্ এমনি সময় বহুদূরে একটা জন্তুর আওয়াজ আসিল। মহেন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিল পুনরায় আওয়াজটার শব্দ শুনিবার জন্য। অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতায় স্থানটা ক্রমান্বয়ে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। নাতিপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা চলে। মহেন্দ্র সাম্‌নের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে সূতার বাণ্ডিলটা শেষ হইয়া আসিতেছিল। পকেট হইতে আর একটা বাণ্ডিল বাহির করিয়া পূর্ব্ব বাণ্ডিলের প্রান্তে নূতনটি বাঁধিল, তাহার পর আবার চলিতে লাগিল। বামে, দক্ষিণে, সাম্‌নে ঘুরিয়া ফিরিয়া পথটা চলিয়াছে। ক্রমান্বয়ে এ বাণ্ডিলের সূতাও শেষ হইয়া গেল, আর একটা যোগ দিল। স্থাপত্যের এরূপ অদ্ভুত নিদর্শন সে কখনও দেখে নাই। চলার পথে মাঝে মাঝে অস্থিখণ্ড পায়ে ঠেকিতেছে। হয়ত দুটি একটি নরমুণ্ডও দেখিয়াছিল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পথের শেষ কোথায় এবং সেখানে কি আছে দেখিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল সে। ইতিমধ্যে সব কয়টি সূতার বাণ্ডিল শেষ হইয়া আসিয়াছে। হাতেরটি ফুরাইয়া গেলে আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। মহেন্দ্র হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। এতটা পথ আসিয়া আবার উপরে উঠিবার সিঁড়ি দেখিল। স্থানটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। সূতা একরকম শেষ হইয়া গিয়াছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়াই বা কি লাভ আছে।

হাতে যেটুকু সূতা আছে সামান্য পথ যাওয়া চলিতে পারে। ঠিক করিল ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কাল প্রাতে ব্যাগ ভর্ত্তি করিয়া সূতার বাণ্ডিল আনিবে। খাদ্য ও ঘড়ি সঙ্গে রাখিবে। প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে বিশ্রাম লইয়া রাতদিন হাঁটিবে, পথের শেষ কোথায় তাহাকে বাহির করিতেই হইবে।

যেখানে মহেন্দ্র দাঁড়াইয়াছিল তাহার ছাদ প্রায় মাথায় ঠেকিতেছিল। ফিরিবার জন্য মহেন্দ্র মুখ ঘুরাইবে এমন সময় অনুভব করিল ক্ষুরযুক্ত ভারি জানোয়ার তাহার মাথার উপর দিয়া দ্রুত পালাইয়া গেল। অনতিবিলম্বে আর একটি ধাবমান জন্তু তাহাকে অনুসরণ করিল। পরেরটির পদশব্দে ক্ষুর ধ্বনি নাই কেবল ছাদের নীচে গম্ গম্ করিয়া শব্দ হইল, ভীষণ ভূমিকম্পের আগে যে রকম মাটির তলায় শব্দ হয়। যেটুকু সূতা হাতে ছিল তাহা লইয়াই মহেন্দ্র পাক খাওয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিল। পনের-কুড়ি ধাপ অতিক্রম করিয়া থাকিবে হঠাৎ তাহার মাথার চাঁদি দারুণ ভাবে কঠিন পদার্থের সহিত ঘসিয়া গেল। মাথাটা ফাটিয়া গিয়াছে। টর্চ উপরে ফেলিতেই দেখিল ঠিক্ প্রথম প্রবেশ পথের মত একটি লৌহদ্বার, হঠাৎ দর্শনে মনে হয় বড় সিন্দুকের কবাট। নীচে একটি অতি বৃহৎ চাবি আটকাইয়া আছে। চাবিটি স্পর্শ করিয়া ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, —ঘুরিল না। ভাবিল ভিতরে মরিচা ধরিয়াছে,—তৎক্ষণাৎ প্রবেশ পথের কব্জার কারুকার্য্যের কথা মনে আসিল। যে কারিগর মরিচার কোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অদ্ভুত ইস্পাত আবিষ্কার করিয়াছে সে চাবির কলকে মরিচার ধ্বংস ক্রিয়া হইতে বাঁচাইবার কি কোন ব্যবস্থাই করে নাই? হইতেই পারে না। মহেন্দ্রের অনুমান মিথ্যা নয়। আলোর সাহায্যে দেখিল বাস্তবিকই কলের চারিপাশে কোথাও মরিচা পড়ে নাই। পিস্তলের বাঁট দিয়া একটু ঠুকিতে চাবি নড়িল। মহেন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আলো লইয়া আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল চাবির শেষাংশে একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত, তাহার ভিতর দিয়া একটি কঠিন ধাতুর কীল্ চলিয়া গিয়াছে। কীলের শেষদিকের উপর পিস্তলের বাঁটকে হাতুড়ির মত ব্যবহার করিতেই কীল্ সরিরা গেল, চাবিটি মাটিতে পড়িল কিন্তু ধাতু পতনের শব্দ হইল না এবং কীল্ একটি ক্ষুদ্র শিকলে ঝুলিতে লাগিল। এখানেও চৈনিককারিগরের শিল্পসৃষ্টির প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। উত্তেজনায় মহেন্দ্র ঘামিয়া উঠিতেছিল। রুমাল দিয়া কপাল মুছিল। চাবি মেঝে হইতে তুলিতে গিয়া দেখিল দীর্ঘকাল ধরিয়া ধূলা জমিয়াছে, যেন মিহি কাপড়ের ভিতর দিয়া ছাঁকা। উপরটা বেশ স্যাঁত্সেঁতে, আধ ইঞ্চি তলায় একেবারে শুক্না, চাবি তাহারই গর্ভে ঢুকিয়া গিয়াছিল। টর্চ জ্বালাইয়া দেখিল ধূলার উপর কোন

জীবের পদচিহ্ন নাই। মহেন্দ্র ধূলার উপরই বসিয়া রহিল। ক্লান্ত হইয়াছিল, একটি সিগারেট্ ধরাইল। সিগারেট্‌টি শেষ হইলেই চাবি লইয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিবে। অসহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে? মহেন্দ্র চাবি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পুনরায় তাহা যথাস্থানে প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইতে লাগিল! দুই একবার এদিক ওদিক করিতেই চাবিটি সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেল। কল ঘুরিয়াছে, এইবার দ্বার খোলা দরকার। মহেন্দ্র বাহু দুইটি উপরে লাগাইয়া সর্ব্বশক্তি ব্যবহার করিয়াও দ্বার উত্তোলন করিতে পারিল না। অবশেষে কয়েক ধাপ উপরে উঠিয়া নিজের পিঠ কবাটের গায়ে লাগাইয়া চাড়্ মারিল,—একবার, দুইবার, তিনবার, চতুর্থবারে শিকড়্ ছিঁড়িবার শব্দের সহিত দ্বারটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইল। আকাশের আলো ঐ সামান্য ফাঁকেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বিশ্ব বিজয়ীর মত বুক ফুলাইয়া আবার দ্বিগুণ শক্তিতে চাড় মারিল। একরাশ চারা গাছ ও ঘাসের শিকড় ছিঁড়িয়া কবাটটি খুলিয়া গেল। আকাশের আলো এবং নির্ম্মল বায়ু মহেন্দ্রকে শক্তিমান বলিয়া অভিনন্দন জানাইল।

যে কয়টি ধাপ বাকি ছিল সে কয়টি অতিক্রম করিতেই মহেন্দ্র তাহার পরিচিত জঙ্গলের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। পালদীঘি, পাথরে বাঁধান ঘাট এবং তৎপার্শ্বে বিরাট, প্রাচীন বট। স্থানটি মহেন্দ্রের নিকট বিশেষ পরিচিত। এইখানেই একের পর এক বহু বাঘ সে মারিয়াছে। মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল জঙ্গলের ভিতর ইহাই একটি মাত্র দ্বার নয়। আরও বহু পথ আছে, সেখান হইতে গত কল্যের বাঘ কালী মন্দিরের উঠানে আসিয়াছিল। অন্য দ্বার তো আছেই, অধিকন্তু সেই সব দ্বারপথ দিয়া ব্যাঘ্র ইত্যাদি জন্তু অনবরত বহুদিন হইতে চলাফেরা করিতেছে। বাঘ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ জানোয়ার। স্থাপত্যজাতীয় কোন গঠন দেখিলেই সে সন্দেহ করিয়া বসে এবং ভিতরে ঢুকিবার আগে বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য গম্যস্থল বহুবার পরীক্ষা করিয়া লয়। অসংখ্য বার পরীক্ষার পর নিশ্চিন্ত হইয়াই তাহারা সুড়ঙ্গ পথে যাতায়াত সহজ করিয়া লইতে পারিয়াছে।

ইতিমধ্যে রৌদ্র উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিশিরসিক্ত পাতায় আলোর ঝলক আসিয়া পড়িয়াছে। দোয়েল ও বুলবুলের মুখে প্রভাতী সুর শুনা যাইতেছে। মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ বায়ুর দোলায় বন ফুলের নানা গন্ধে স্থানটিকে মনোহর করিয়া তুলিতেছে। মহেন্দ্র ভাবিল পিস্তল লইয়াই একটা শিকার করিয়া ফেলিলে মন্দ হয় না। বৃহৎ পিস্তল, ছোটখাট রাইফেল্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না,

তাহার উপর লম্বা বাঁট পরাইবার ব্যবস্থা আছে। মহেন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া জঙ্গলে ঢুকিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঢুকিবার আগে হাতের সূতার শেষ অংশ একটি ডালে বাঁধিয়া রাখিল। শিকারের নেশার মত আকর্ষণ আর কিছুতে আসে কি না সন্দেহ। পিস্তল প্রস্তুত রাখিয়া আঁকা বাঁকা পথে চলিতে লাগিল। সহসা ক্ষুরযুক্ত চতুষ্পদ জন্তুর ধাবমান শব্দ শুনিল। অভিজ্ঞ শিকারী বুঝিল হরিণ তাহার অতি নিকট দিয়া বাম দিকে পালাইয়াছে। মহেন্দ্র শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল এবং অল্প সময়ের ভিতর টাট্‌কা ক্ষুরের চিহ্ন বাহির করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। হাতের অস্ত্রটী বিশ্বাসযোগ্য হইলেও দূর হইতে উহার সাহাযো শিকার করা সম্ভব নয়, নিকটে গিয়াই মারিতে হইবে সুতরাং জন্তুর যত কাছে যাওয়া যায় ততই শিকার সম্বন্ধে সফলতার সম্ভাবনা বেশী। অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছে, ক্লান্তিবোধ করিতেছিল কিন্তু টাট্‌কা ক্ষুরচিহ্নের আকর্ষণও কম নয়। মহেন্দ্র পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল হঠাৎ একটী স্থানে পা পড়িতে ফাঁপা জায়গার সঙ্কেত পাইল। আর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। পিস্তলের বাঁট দিয়া ঠুকিল, সত্যই আওয়াজটা ফাঁপা। দ্বার পথের কোন চিহ্ন নাই। অপর স্থানের সহিত ফাঁপা স্থলের লেবেল এক হইয়া গিয়াছে। উপরে চাপ্‌ড়া মুথো ঘাস জন্মাইয়াছে। যদি মাটির তলায় দ্বার থাকে ত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে সামান্য ছুরির দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু ফাঁপা স্থানটী চিনিবার জন্য একটী বিশেষ চিহ্ন রাখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন আছে। একটী মোটা ডাল কাটিয়া তাহার সহিত একটা রুমাল বাঁধিয়া মাটিতে পুঁতিবার চেষ্টা করিল। ডালের শেষ অংশ যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগের পরেও যৎসামান্য মাটির ভিতর ঢুকিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। মহেন্দ্র বসিল এবং যে স্থানে ডালের শেষাংশ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল ছুরির ডগা দিয়া গভীর ভাবে কাটিয়া ফেলিল। কৌতূহলী মহেন্দ্র ফল পাইয়াছে, আর একটী লৌহদ্বার আবিষ্কৃত হইল। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ইহা রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর কেহ খুলে নাই। কালের গতির সহিত তাহার উপর দিয়া বৃষ্টিতে ধুইয়া গলিত মাটি বহিয়া গিয়াছে। তাহা পরে রৌদ্রের উত্তপ্ত কিরণে শুকাইয়া ইহার উপর উদ্ভিদের আগমন। প্রথম আবিষ্কৃত দ্বারের আনুমানিক পরিধি ঠিক করিয়া মহেন্দ্র খানিকটা সরিয়া আসিল, তাহার পর পা দিয়াই মাটির উপর আঘাত করিল। ফাঁপা শব্দ পাওয়া গেল না। এবার সে পরিত্যক্ত ডালটী লইয়া আসিয়া ছুরির সাহায্যে যতটা সম্ভব গর্ত্ত কাটিয়া ডালটী পুঁতিয়া ফেলিল। ইহাও স্থানটী ভবিষ্যতে চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কারণ সাম্বার হরিণ ইহার উপর গাত্র ঘর্ষণ করিলে, অথবা বেগবান ঝড় বহিয়া যাইলে

সামান্য ঠেকায় দণ্ডায়মান ডালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মহেন্দ্র ডালটী সেই স্থানে পুঁতিল এবং নিজের কোট ছুরির সাহায্যে অসংখ্য টুকরায় ছিন্ন করিয়া প্রত্যেকটী টুকরার শেষাংশে বাঁধিল। টুকরার অংশগুলি একত্রিত হওয়ায় দৈর্ঘ্য তাহার কম হইল না। মহেন্দ্র প্রোথিত ডালের সহিত অন্য গাছের দুই তিনটী গুঁড়ি বাঁধিয়া ফেলিল। ঝড়ই আসুক আর সামবার হরিণ কোন অংশ ছিঁড়িয়াই ফেলুক আজিকার দিন ও রাতটা কাটিলে কাল মহেন্দ্র একটা পাকা বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। এইবার মহেন্দ্র দোমনা হইয়া গিয়াছে, —বাড়ী ফিরিবে, না শিকারের পিছু লইবে। এতক্ষণে হরিণগুলা কোন স্থানে নিশ্চিন্ত ভাবে দাড়াইয়াছে, শুকনা পাতার আওয়াজ বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে নিশ্চয় একটা মারিতে পারিবে। শিকার তাহাকে টানিল। ডাল পুঁতিয়া পুনরায় পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিল। হঠাৎ অনতিদূরে লেপার্ডের ডাক শুনিল। সঙ্গে সঙ্গে এক পাল হরিণ তাহার সামনে দিয়া পালাইতে লাগিল। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি একটী বড় গাছের গুড়ির তলায় আশ্রয় লইল। হরিণ এত কাছ দিয়া ছুটিয়া পালাইয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সে একটা মারিয়া ফেলিতে পারিত কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি সাবধান করিয়া দিল,—লেপার্ড হরিণের পালকে অনুসরণ করিতেছে। দলটি বড় বলিয়া আক্রমণ করে নাই। দল হইতে কোন একটি ছটকাইয়া পড়িলেই আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। যদি পলাতক জন্তুদের ভিতর একটি মারিত এবং নিকটে আসিয়া মহেন্দ্র নিজে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে সামান্য অন্যমনস্কতার সুবিধা লইয়া লেপার্ড পিছন হইতে হরিণ ছাড়িয়া তাহাকেই আক্রমণ করিত এবং ঘাড়ের উপর একটি কামড়েই মহেন্দ্রের ভবলীলা শেষ হইয়া যাইত।

মহেন্দ্র নিস্তব্ধ ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনুমান মিথ্যা হয় নাই। অল্পক্ষণ পরেই দেখিল লেপার্ড মাটিতে গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে ধীরে অগ্রসর হইতেছে তাহারই দিকে। হঠাৎ দাঁড়াইয়া চারিধার দেখিতে লাগিল, হরিণের গন্ধের সহিত মানুষের গন্ধও পাইয়াছে। পাওয়ারই কথা,—সকালের হাওয়া অনুকূল ভাবে বহিতেছিল। আর দুইএক পদ অগ্রসর হইয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, তাহার পর লেজ নাড়িতে লাগিল। আচরণটী লম্ফ প্রদানের পূর্ব্ব লক্ষণ। সে মহেন্দ্রকে দেখিয়াছে। চৌদ্দ, পনের হাতের ভিতর লেপার্ড উক্ত অবস্থায় বসিয়াছিল। মহেন্দ্র একই সঙ্গে দুই তিনবার ঘোড়া টিপিয়া দিল। লেপার্ড লাফাইল না, শুইয়া পড়িল। শোয়া অবস্থায় দুই একবার পা ছুঁড়িয়াছিল, পরক্ষণে সব শেষ হইয়া গেল। মহেন্দ্র খুশী হইয়া উঠিয়াছে, পিস্তল দিয়া কখনও

সে শিকার করে নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন নিশ্চিত হইল জন্তুটী এখন প্রণাহীন তখন সে অগ্রসর হইয়া গেল। এক পা, দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতেছে আবার থামিতেছে। একেবারে যখন নিকটে আসিয়া পড়িল তখন আর ভয়ের কারণ কিছু থাকিল না, বাঘটা মরিয়াছে।

কিভাবে লইয়া যাইবে তাহার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার,—একটি ত নয়, দুইটী। এখান হইতে আবার কালীবাড়ী যাইতে হইবে, সেখানে বড় বাঘটী রহিয়াছে। মাঝ পথে আর একটি জুটিয়া যাইতে পারে। আগের গুলি খাওয়া বাঘটি নিশ্চয় কোন স্থানে মরিয়া পড়িয়া আছে। এইবার ফিরিয়া ডোমপাড়ায় যাইতে হয়, বেশী বেলা হইলে পুরুষগুলি কাজে চলিয়া যাইবে। ডোমপাড়ার সর্দ্দার মহেন্দ্রকে বিশেষ খাতির করে কারণ মহেন্দ্রের কৃপায় বহুবার সে শূকরের মাংসের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছে। মহেন্দ্র সেদিনকার মত ফিরিবে ঠিক করিয়া ফেলিল। ফিরিবার পথে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় মনে হইল বাঘ যে স্থানে মরিয়াছে তাহা অস্বাভাবিক ভাবে সমতল। মহেন্দ্র ফিরিল না, যে দিক দিয়া হরিণ ছুটিয়া আসিয়াছিল সেইদিকে চলিতে লাগিল, যদি তাহার আনুমানিক দ্বারটার সন্ধান পাইয়া যায়। একটি স্থানে আসিয়া আর মৃগের পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না। এইখানে বট হইতে আরম্ভ করিয়া নানা গাছের গুঁড়ি একত্রে সমবেষ্টিত হইয়াছে। চতুষ্পার্শে ঘন উচ্চ ঝোপ। মহেন্দ্র ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। অদ্ভুত লাগিল। স্থানটী পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের চাতালের মত,—পালদীঘির চাতালের মতই লাল পাথরে তৈয়ারী, বহুকাল ধরিয়া রৌদ্র প্রবেশ করে নাই। যে সব স্থানে পাথর সরিয়া গিয়াছে সেই ফাটলের ভিতর দিয়া কুলগাছ জন্মাইয়াছে। পদতলে পিচ্ছিল শ্যাওলা এবং অগণিত কুলের বীচি ও তৎসহ মৃগের পদচিহ্ন। মহেন্দ্র সামনের দিকে আগাইয়া যাইতে দেখিল ছোট ডোবা, এখনও জল রহিয়াছে। চতুষ্পার্শে দ্রাবীড়দের অনুকরণে পাড়গুলি পাথর বাঁধানো। সে ঘাটে নামিল। কাকচক্ষুর মত জল। এইরূপ স্থানে জল এত পরিষ্কার হয় কেমন করিয়া? বিশেষ করিয়া প্রত্যহ যখন এখানে মৃগের পাল আসিয়া কর্দ্দমাক্ত করিয়া ছাড়ে?

জল পরিষ্কার থাকার কারণ অতি অল্প সময়ের ভিতর বাহির হইয়া পড়িল। বিপরীত দিকে সিঁড়ির ধাপের উপর হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া পাড় বহিয়া জল পড়িতেছে এবং নীচে অধিকন্তু জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য একটি বৃহৎ নর্দ্দমা রহিয়াছে।

মহেন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল যেখানে পানীয় জলের ঐরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে

সেখানে নিশ্চয় সব সময় মনুষ্য সমাগম হইত সুতরাং কাছাকাছি কোথাও দ্বার আছে। হরিণ, বাঘ ইত্যাদি জন্তুর ভূগর্ভে প্রবেশ পথটী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মহেন্দ্র প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পুষ্করিণীর সর্ব্বদিক সন্ধান করিয়া ফিরিল কিন্তু তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। আর হাঁটিবার শক্তি নাই, ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, খানিকটা জিরাইয়া পালদীঘির দ্বারপথের দিকে চলিতে লাগিল। দ্বারের নিকট আসিয়া মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল ভিতর হইতে এই ভারি লৌহ কবাট বন্ধ করিবে কেমন করিয়া? কবাট সম্পূর্ণ মাটির সহিত না ঠেকিলেও এমন অবস্থায় আছে যে সিঁড়ির ধাপে নামিয়া কবাটের মুখ হাত দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না। অবশ্য কব্জা কোথায় আছে জানা গিয়াছে সুতরাং ব্যবস্থা হইতে সময় লাগিবে না। দীঘির নিকট হইতে একটি বড় পাথরের ভগ্ন মূর্ত্তি গড়াইতে গড়াইতে লইয়া আসিল। কব্জার নীচে এমন ভাবে রাখিল যাহাতে সিঁড়ির ধাপে নামিয়া দরজার ডগা নাগাল পাওয়া যায়। ইহার পর সুতাটী জল হইতে খুলিয়া সুড়ঙ্গ পথে ঢুকিয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

(৯)

মীমাংসা

গুপ্তধন আবিষ্কারের প্রেরণা ও সূত্রপাত বল্লভপুরের মাঠ ও অত্রস্থ কালীবাড়ী। ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ পথ যে দিন হইতে আবিষ্কার হইয়াছিল সেইদিন হইতে মহেন্দ্র প্রত্যহ নূতন কিছু বাহির করিবার কৌতূহল দমন করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, ক্ষ্যাপার মত গহ্বরে, গহ্বরে, সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে প্রতিক্ষণে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, অবলীলাক্রমে সব কিছুই সে সহ্য করিয়াছে গুপ্তধনের সন্ধানে। মন্দিরের ভিতর দিয়া পথ করিলে সুবিধা বেশী পাইত কিন্তু জঙ্গলের পথটিই নিরাপদ ভাবিয়াছিল কারণ শার্দ্দুলের মত হিংস্র জন্তুকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস কাহারও আসিবে না; আসিলেও এমন অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে যাহা কোন সাধারণ জমিদারও সংগ্রহ করিতে পারে না। একলা আসিবারও সাহস কাহারও হইবে না। দল বাঁধিয়া শিকার করিতে আসিলে তাহার অনুমতির প্রয়োজন আছে। সে অনুমতি দিবে কেন! এই সব কারণে জঙ্গলের পথটিই মহেন্দ্র নিরাপদ ভাবিয়াছিল। তাহার পর যে দিন সে রত্নাগার আবিষ্কার করিয়াছিল সেদিনকার

কথা এখনো তাহার মনে আছে। অসংখ্য নরকঙ্কাল পার হইবার সময় প্রতি পদ-বিক্ষেপে জিঞ্জিরগুলি কি ভাবে দুলিয়া উঠিতেছিল। জিঞ্জিরবদ্ধ দোদুল্যমান নরকঙ্কালের বীভৎস ঠোকা ঠুকি চোখের সামনে দেখিয়াছে তথাপি সে ভীত হয় নাই। স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রাকে ঘরের পর ঘর সাজান দেখিয়াছে, বৃহৎ উইয়ের ঢিপির মত সমস্ত স্থানে বিক্ষিপ্ত। যখন সে এই মহারত্নাগারের সন্ধান পাইল তখন তাহার যৌবনের বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু অন্তরের যৌবন মরে নাই, দেহের শক্তিও অটুট থাকিয়া গিয়াছে। রত্ন সন্ধানে মহেন্দ্র যে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছিল—সমাজ সংস্কার সব কিছুর বাহিরে থাকিয়া সেই দীর্ঘ সময় সহজ জীবন ধারায় বাঁচিবার চেষ্টা করিলে মহেন্দ্র হয়ত আজ রাজনৈতিক, সাহিত্যিক অথবা দার্শনিক হইয়া সাধারণের নিকট মান্যবর হইয়া উঠিত। সাধারণকে মহেন্দ্র চিরকাল দয়ার পাত্র ভাবিয়া আসিয়াছে সেই কারণে উহাদের প্রশংসার জন্য কখনো সে লালায়িত হয় নাই অথবা তাহাদের নিন্দায় চাঞ্চল্য আসে নাই। সে নিজের খেয়ালেই চলিয়াছে।

অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও মহেন্দ্রকে কেন গ্রামেই থাকিতে হইয়াছিল তাহা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। যেদিন রাসমণির গর্ভে মহেন্দ্রের ঔরষজাত সন্তান জন্মাইয়াছিল সেইদিন হইতেই তাহার চরিত্রে একটি নূতনত্বের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। সে প্রতি নিয়ত ভাবিতেছিল রাসমণি ও তাহার পুত্রের সম্বন্ধে একটা কিছু হওয়া দরকার। দিনের পর দিন শিশু যত বাড়িয়া উঠিতেছিল ততই মহেন্দ্রকে এক অজ্ঞাত শক্তি মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল। বন্ধনটাই মহেন্দ্রের নিকট নূতন ব্যাপার। বহুপূর্ব্বে একবার এইরূপ ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল। রাজকুমার কলেজে পড়িবার সময় কোন রাজকুমারীর প্রতি আসক্তি ক্রমান্বয়ে গভীর হইয়া পড়ায় মহেন্দ্র তাহার পীড়ন সহ্য করিতে পারে নাই, অত্যন্ত সোজা ভাষায় রাজকুমারীর পানি প্রার্থী হইয়াছিল। উত্তরে রাজকুমারী বলিয়াছিলেন—তোমার প্রাসাদ আমার আস্তাবলেরও সমান নয়, সেখানে থাকিব কেমন করিয়া। মহেন্দ্র কোন সময়েই প্রিন্সের ধাপ হইতে নামিতে পারে নাই, উত্তরে বলিয়াছিল—তোমাকে ভালবাসিয়াছি, বাঁচিয়া গেলে। তুমি না হইয়া তোমার বাবা মহারাজা···এই কথাগুলি বলিলে তাহার জিভটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতাম, ধারাল অস্ত্রদ্বারা কাটিতাম না। তোমার দাম্ভিকতার ঈষৎ আভাস আগে পাইলে তোমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া তোমাকে এই সম্মান দিতাম না। ব্যবহার ভিন্নরূপ হইত। এখন আমার আদেশে আমার সাম্‌নে হইতে সোজা চলিয়া যাও। মাঝপথে যেখানে দাঁড়াইবে সেইখানেই পিস্তলের

গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব, আমার টিপ কখনও ভুল হয় না। খুলি উড়াইয়া দিবার কথা শুনিয়াও রাজকুমারী ভীত হন নাই, মহেন্দ্রের সাম্‌নে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া তাহার গণ্ডে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়াছিলেন।

মহা শক্তিমান মহেন্দ্রের দৈহিক ও মানসিক চাঞ্চল্য কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। রাজকুমারীর কান ধরিয়া মজলিসের পাশে প্রেমিকদের ঘরে লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর কি হইয়াছিল আমরা জানিতে পারি নাই। এইটুকু মাত্র জানি, সমস্ত রাত্রি রাজকুমারী সেইঘরে বন্দিনী ছিলেন এবং পরে এই ঘটনা লইয়া লোকে নানা কথাও বলিয়াছিল। মহেন্দ্রকে স্বয়ং মহারাজাও (রাজকুমারীর পিতা) ঘাঁটাইতে সাহস পান নাই।

ফুটন্ত যৌবনের অকপট প্রেম নিবেদন প্রথমবার এইভাবে প্রত্যাখ্যানের হিমবৎ চাপে রসের উত্তাপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর সে স্ত্রীলোককে কখনো বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নানা দেশের সুন্দরী নানা বেশে ভূষিতা হইয়া তাহার নিকট আসিয়াছে, নানা ভাষায় ও প্রথায় প্রেম নিবেদন করিয়াছে, মহেন্দ্রও প্রতিদানে গলিবার লক্ষণ দেখাইয়াছে কিন্তু কখনো আসলে গলে নাই— হৃদয়টাকে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল। বহুদিন পরে ভাল লাগিল রাসমণিকে। তাহার প্রেমের বিনিময়ে সব কিছুই করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাহাও ত' হইল না। সে কম বয়সের ছোকরা দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মহেন্দ্র তাহাকে কথা দিয়াছিল, কিছুদিন অপেক্ষা করিলে কলিকাতায় লইয়া যাইবে কিন্তু তাহার ধৈর্য্য সহিল কই? সেইতো গাল ফোলা জমিদার ছোটকর্ত্তাকে লইয়া আসিল এবং তাহারই জন্য মহেন্দ্রের সহিত কথা পর্য্যন্ত বলিল না, চোখের সাম্‌নে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। এতবড় অপমান রাসমনি করিতে পারিল কেমন করিয়া, মহেন্দ্র ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার ভালবাসাকে মহেন্দ্র বিশ্বাস করিয়াছিল। রাসমণির মত স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিলে যা ফল হইতে পারে তাহা ঘটিয়াছে। শুধু কি ভালবাসার দিক দিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে? সে দান করিয়া এককালে ফতুর হইয়াছে, দানগ্রাহীর দল আজ তাহাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয়। ক্রমান্বয়ে তাহার অন্তরে যাহা কিছু নরম ছিল, কৃতজ্ঞতা ও সমবেদনার অভাবে সময়ের গতির সহিত তাহা পাথরের মত দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হইয়া গিয়াছে। মানুষের দুঃখে তাহার হৃদয় এখন কোনরূপ সাড়া দেয় না বরং সুখীকে শাস্তিদ্বারা অন্যায় সুখভোগ হইতে নিরস্ত করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। মহেন্দ্র তাহার অদ্ভুত যুক্তি আনিয়া নিজের আচরণকে সমর্থন করে, সেও ত মানুষ হইয়াই জন্মাইয়াছিল। কোন্ দোষে সে সুখ ও শান্তির

কণামাত্র পাইল না এবং যদি পাইবার সম্ভাবনা ঘটিল তবে বিধাতার কঠোর আদেশে তাহা খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল কেন? মহেন্দ্র এখন চায় লোকে তাহাকে ভয় করুক। সে আদেশ করিয়া আনন্দ পায় কারণ তাহার ধারণা জন্মাইয়াছে আদেশ মানাটাই সাধারণের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, নীতি, শিক্ষা, রুচি সব কিছুতেই সাধারণ যে আদর্শ গড়িয়া তোলে তাহার ভিতর অজ্ঞাত ভাবে শক্তিমানের আদেশ থাকে। সাধারণের বুদ্ধিটাও দল বাঁধিয়া গড়িয়া উঠে এবং হাজার ভুল একত্রিত করিতে পারিলে সংখ্যার জোরে একটী সত্যকে অস্বীকার করিতে তাহাদের কিছুমাত্র দ্বিধা আসে না। এই সাধারণের মতামতকে মহেন্দ্র বড় করিয়া দেখিতে পারে নাই। পিসামার আঁচল ধরা পুরুষকে সে চিরকাল কৃপা করিয়া আসিয়াছে। যে সব মানুষ সব রকমের দৈন্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যে সব মানুষ দাতার দান স্বীকার করিতে পারে না, যে সব মানুষ অকৃতজ্ঞতাকে আত্মসম্মান প্রকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভাবে, সে সব মানুষ বড়র নিকটে মাথা নীচু করিতে পারে না। মহেন্দ্র তাহাদের হেয় ভাবিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। জীবন সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতে মহেন্দ্র সংসারের অধিকাংশ মানুষকে হেয় করাটা স্বভাবে দাঁড় করাইয়াছে, হৃদয় তাহার পাষাণ হইয়া গিয়াছে। মানুষের হৃদয় যখন পাষাণবৎ হইয়া যায় তখন তাহার যাবতীয় উচ্ছ্বাসেও কাঠিন্য আসিয়া পড়ে, মহেন্দ্র কঠিন হইয়াই বাঁচিয়াছিল। কতবার সে ভাবিয়াছে—ধনাগার হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের কোন শহরে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে কিন্তু তাহা সম্ভই হয় নাই। গুপ্ত ধনের নগণ্য অংশ বাহির করিতে হইলেও লোকের সাহায্যের দরকার। যখনই তাহারা তাল তাল সোনা ধনাগার হইতে বাহির করিতে আরম্ভ করিবে তখনই অর্থকোষের খবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে; হাজার হাজার মানুষ ছুটিয়া আসিবে ধনলুণ্ঠন করিতে। লুণ্ঠন করিতে যদি নাও আসে তাহা হইলেও নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে কয়জনকে স্বর্ণমুদ্রা বহন করিবার ভার দেওয়া হইবে তাহাদের প্রত্যেককে খুন না করিলে নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সরকার হয়ত একটী বিশেষ আইনের প্যাঁচ ফেলিয়া সমস্ত রত্ন বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিবেন। ট্রেজার ট্রেড্ এ্যাক্টে নানা বিভাগ আছে। রত্নাগার কোন বিভাগের মধ্যে যে পড়িয়া যাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়। শহরে ফিরিয়া পুরাতন চালে থাকিবার চেষ্টা করিলে পুলিশে সন্দেহ করিবে কারণ দেউলিয়া ঘোষণা হইবার পর সে রামগড়ে বসবাস করিতে আসিয়াছে। এমন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে বলিতে পারে অর্থ তাহার স্বোপার্জ্জিত। মহেন্দ্র এখন

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে! ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু শীত বোধ করিল। সাম্‌নেই শীত কমানোর ঔষধ ছিল, অমিশ্রিত ব্রাণ্ডি অনেকটা খাইয়া ফেলিল। ভোরের চুমুকে বোতলটি খালি হইয়া গেল। মহেন্দ্র উঠিয়া পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। ছোট পরিধির ভিতর এইভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে যে কোন সাধারণ মানুষ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইত। মহেন্দ্রের হইল ঠিক বিপরীত, তাহার মাথা পরিষ্কার হইতে লাগিল,—জটিল সমস্যা তাহার নিকট সহজ হইয়া আসিতেছিল।

সে মনশ্চক্ষে দেখিতেছিল পালদীঘির জঙ্গল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জীবনের ব্যর্থতার পূর্ণাহুতি অরণ্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত বিলীন হইয়া যাইতেছে। দূরে, বহুদূরে মহেন্দ্রের অন্তর্ধানের বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িতেছে। বার্ত্তাগ্রাহী সাধারণ জীব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। পিশাচ মরিয়াছে,—আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে! যে আগুন সে নিজে লাগাইয়াছিল সেই আগুনেই দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

অগ্নির গতি সব সময়ে একমুখি নয়। রাসমণির গৃহেও স্ফুলিঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। রাসমণি ও তাহার পুত্র বাহিরে থাকায় জানিতে পারে নাই। তাহার স্বামী নলীন মহেন্দ্রের কৃপায় স্থবিরতার পাপ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি পাইয়াছে। ছোটকর্ত্তা রাসমণি ও তাহার পুত্রকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছেন।

মহেন্দ্র যে ঘটনাগুলি মনশ্চক্ষে দেখিতেছিল তাহা তাহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বেই প্রত্যেকটি বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—কিভাবে হইয়াছিল তাহা পিশাচসিদ্ধ প্রিন্‌স্‌ মহেন্দ্রই জানেন। পুরাতন দারোগার অন্তর্ধানের খবর কাগজে কাগজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রিন্‌স্‌ মহেন্দ্রকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পালদীঘির জঙ্গল বিস্তৃত পরিধি লইয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া গিয়াছে। সাধারণে সান্ত্বনা পাইয়াছে পিশাচ মরিয়াছে ভাবিয়া।

সমাপ্ত